ঝল্‌মলি



পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৯

প্রকাশক
সমীরণ চৌধুরী
কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রণ ঃ
শ্রী দুর্গা প্রেস
১৭/৩/সি, ঝামাপুকুর লেন, কলি - ৯

বর্ণ সংস্থাপন ঃ
লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
মদন সরকার

ঝলমলি সারাক্ষণ ঝলমল করে। ওর জীবনে কোনো দুঃখ নেই, বিষাদ বা বিষণ্ণতা নেই, সারাক্ষণই খুশিতে ঝলমল। শুধু খুশিতে কেন, পোষাকে ঝলমল, প্রসাধনে ঝলমল, অলঙ্কারে ঝলমল। অলঙ্কার বলতে সোনাদানা হীরে মানিকের জড়োয়া অলঙ্কার নয়, নানা ধরনের বিচিত্র সব অলঙ্কার, কোনোটা মাটির, কোনোটা কাঠের, কোনোটা বা স্টিলের, কত বিচিত্র তাদের গঠন! কোনটা বা এত বড়ো তো কোনটা বা এইটুকুনি! একদিন দেখলাম কানে এত্তো বড়ো বড়ো দুটো স্টিলের রিং ঝুলিয়েছে যেগুলি হয়তো হাতে পরলেই চলত! আবার একদিন দেখলাম গলায় কি একটা কাঠের না হাড়ের মালা ঝুলিয়েছে যেটা হয়তো আফ্রিকার জংলিদের গলাতেই ছবিতে দেখেছি মনে হয়।

ঝলমলির পোষাকগুলোও বিচিত্র! কোনোদিন মাটিতে লুটিলুটি ঘাঘরা তো কোনোদিন হাঁটুর অনেকটা ওপরে ফ্রকের মতো, আবার কোনোদিন মাঝামাঝি—অর্থাৎ হাঁটুর নিচে খানিকটা নেমে থমকে গেছে চাপচাপ প্যান্ট না পাজামা—কি বলব! হ্যাঁ আবার প্যান্টও আছে, জিনসের প্যান্ট আর টাইট গেঞ্জি—তখন উথলে পড়ে ঝলমলির নবীন যৌবন! সেদিন ওর দিকে তাকানো যায় না, ওর কাঁধ পর্যন্ত রেশমী চুল হাওয়ায় ওড়ে, বারবার কপালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঝলমলি সেগুলোকে হটায়, আবার নেমে আসে...!

ঝলমলির বয়স আঠারো। মাধ্যমিকের ছাত্রী ঝলমলির বয়স আঠারো কারণ সে সপ্তম শ্রেণিতে ফেল করে দ্বিতীয় বারে অষ্টম শ্রেণিতে ওঠে, অষ্টমে কোনোক্রমে টায়েটুয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, আবার নবম শ্রেণিতে গাড্ডু। দ্বিতীয়বারে নবম থেকে কোনোরকমে পাশ করেছে, নাকি বাপের চেষ্টায় ধরাধরি করে উঠেছে জানি না, এবার মাধ্যমিক দেবে, তাই ঝলমলি আঠারো বছরের দুরন্ত যৌবনা অথচ কিশোরী।

সত্যিই কিন্তু ঝলমলি মনেপ্রাণে কিশোরী। ওর কথাবার্তায় ওর ভাবনায় ওর ব্যবহারে কৈশোরের সরলতা এবং বোকা বোকা চালাকি মেশামিশি।

ঝলমলির প্রতি দুর্বলতায় আমি কি ওর কৈশোর চেতনার পক্ষে বেশি নম্বর দিচ্ছি? তা হলেও হতে পারে, কারণ আমি ওর প্রতি যথেষ্ট দুর্বল এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহই নেই। আমার দুর্বলতা আমি আবিষ্কার করি যেদিন ঝলমলি—

জড়োয়া গহনা যে ঝলমলি পরে এবং শাড়িও— সেটা আমি সেদিন প্রথম দেখলাম! গভীর সবুজ রঙের জমি আর সোনার পাড় ওই শাড়িকে কি বলে? বেনারসি? নাকি সাউথ ইন্ডিয়ান? ওসব আমি চিনি না জানি না, শুনেছি মাত্র! সেদিন ওর গলায় জড়োয়া হার, ও কি হীরের কুচি বসানো? কানে ঝুলছে ও নিশ্চয়ই হীরের দুল, হাতের বালায় এমনকি মুকুটের মতো হেয়ার ব্যান্ড তাতেও হীরের কুচি! ওগুলো ইমিটেশন নয় নিশ্চয় কারণ ঝলমলির ব্যবসায়ী বাবার অঢেল টাকা! এতসব হীরা তাকেই মানায় যার অমন রূপ আছে! ঝলমলি রাজকন্যার মতো সেজেগুজে বাবা মায়ের সঙ্গে গাড়িতে উঠছিল ঠিক তখন আমি এলাম, ঝলমলিকে দেখলাম আর ওর গভীর সবুজ শাড়ির সমুদ্রে ডুবে গেলাম! তখনই আমি বুঝলাম আমার দুর্বলতা কত গভীর।

—আপনি আজ এলেন? —মৃদু স্বরে বলল ঝলমলি, —আজ তো আমরা বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি, আপনাকে আগের দিন বলতে ভুলে গেছি—

অমন ভুল ঝলমলির হামেশাই হয়। ওর ভুলগুলিই তো ওর অলঙ্কার! সেই জন্যই তো ও ঝলমলি। তাছাড়া আজকের ভুলটা যদি না হতো তাহলে কি আমি ওকে এমন সুন্দর সাজে দেখতে পেতাম! তাহলে এমন করে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে হারাতাম! যদিও এ হারানোয় যন্ত্রণা আছে তবু শিহরণও তো আছে!

এঃ! এ সেই রাখাল বালক আর রাজকুমারীর পুরনো গল্প নাকি? হয়তো তাই! কিন্তু আমি তো আর সত্যিই রাখাল বালকের মতো সহজ সরল নই! আমি পোড়খাওয়া যুবক! আমি জানি এই মুগ্ধতা শুধুই মুগ্ধতা, ভালোবাসা নয়! আমি

ঝলমলির অঙ্কের মাস্টার। মাস্টার হিসাবে আমার সুনামের জন্য ওর বাবা আমাকে খুঁজে নিয়ে এসেছেন, মাইনেটাও বেশ! কোনোভাবে মাধ্যমিকে উৎরে দিতে হবে এটাই ওনার ইচ্ছা। 'ইচ্ছা' বলছি, শর্ত নয়, কারণ উনি জানেন টাকা যতই দেওয়া হোক না কেন এক্ষেত্রে অন্তত সফলতা অন্য অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে।

অঙ্কে ঝলমলির মাথা একেবারে পরিষ্কার! নির্মল আকাশের মতো পরিষ্কার। কোথাও সাদা বা কালো বা রঙিন কোনোরকম মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। আমি যতভাবেই বোঝাই, যেভাবেই মগজে ঢোকাতে চেষ্টা করি কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মগজে একটুও কি ঢোকে!

একটা অঙ্ক ও মাঝে মাঝেই করে। সে অঙ্কটা অবশ্য সিলেবাসে কেন, কোনো অঙ্কের বইতেও নেই, সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে দেখি পড়ার টেবিলে দুটো কাচের প্লেট, তাতে অল্প জলে ভাসছে গোলাপের পাপড়ি। প্রথম যেদিন ওগুলো দেখেছিলাম ভেবেছিলাম গোলাপের গন্ধে ঘরের বাতাস সুগন্ধিত করতে বুঝি রাখা হয়েছে। কিন্তু একদিন এসে ওকে গোলাপের পাপড়ি নিয়ে অঙ্ক কষতে দেখলাম। ওর হাতে ছিল একটা বড়ো গোলাপ, তা থেকে পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ও এ-প্লেটে একবার ও-প্লেটে একবার ফেলছিল, আর বিড় বিড় করে সংখ্যা গুনছিল। আমি যখন ওর কাছে এসে দাঁড়ালাম তখন ও একটি পাপড়ি ফেলে বলল—'আট', তারপর আমাকে দেখে ইশারায় বসতে বলে আরেকটি পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে থমকে গেল, বলল—কোন প্লেটটায় ফেললাম বলুন তো?

আমি সত্যিই দেখিনি, শুধু আট সংখ্যাটা শুনেছি, তাই বললাম, ও হাসল, বলল—ঠিক আছে, তাহলে এই ডানদিকের প্লেটে ফেলেছি, বলে একান্ত মনোযোগ সহকারে নয়, দশ, এগারো, বারো ইত্যাদি গুনতে লাগল আর এ-প্লেটে ও-প্লেটে পাপড়ি ফেলতে লাগল। শেষ হলো তিরিশে। সুতরাং ডানদিকেই শেষ হওয়া উচিত, কিন্তু হলো বাঁদিকে। হতাশ হয়ে ও বলল—ইস্, ঠিক কোথাও ভুল করেছি!

আমি বললাম—ব্যাপারটা কি?

—ও একটা প্রবলেম, একটা ব্যাপার— সেটা হবে কি হবে না দেখছিলাম, মানে জোড় হলে হবে, বিজোড় হলে হবে না, কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল।

—এর জন্য এত খাটুনির কি আছে? —আমি বললাম, —একটা টাকা নিয়ে হেড টেল করলেই তো হয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এত এত ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা, এই দিয়েই তো শুরু হয়!

—ওসব পুরনো প্রথা। তাছাড়া বড্ড চটপট 'ডিসিশন' নেওয়া হয়ে যায়। এটাই 'লেটেস্ট', কেমন ধাপে ধাপে একটু একটু করে এগোনো—

—ঠিক সিঁড়ি ভাঙা সরলের অঙ্ক! —আমি বললাম।

—ধুর! একটাও সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক আমি জীবনে ঠিক করে উঠতে পারিনি।

ঝলমলির চারটে মোবাইল ফোন। তার কোনটা লাল, কোনটা কালো, কোনটা লালসাদা অর্ধেক অর্ধেক! একটা ফোল্ডিং, একটা স্লাইডিং—এগুলি টেবিলে সাজিয়ে রেখে পড়তে বসে ও এবং অঙ্কের প্রথমাংশে, মধ্যাংশে, তৃতীয়াংশে—বারে বারেই বাজতে থাকে, সেগুলি ধরে—অমুক বলছিস? আমি এখন একটু ব্যস্ত আছিরে একটু পরে তোকে রিং ব্যাক করব—এটুকু বলেই কিন্তু থামে না, সামান্য কথা তো বলতেই হয়! সুতরাং অঙ্ক হোঁচট খেতে খেতে এগোয়, এগোয় নাকি পিছোয় বলতে পারি না।

কিন্তু এ নিয়ে রাগারাগি করার উপায় নেই। এটা ওর বাবার অনুরোধ। মেয়ে ওনার খুব পয়া, ওনার সামান্য ব্যবসা ও হওয়ার পর থেকেই নাকি ফুলেফেঁপে এতবড়ো হয়েছে! বোঝো! ওনার অধ্যবসায়, পরিশ্রম কিচ্ছু নয়! পয়া মেয়ের জন্যই সব হয়েছে! অতএব আমাকে—

তা বলে একথা ঠিক নয় যে ও অলস, তা নয় মোটেই! টেস্টে অঙ্ক পরীক্ষার দিন সকালে যেতে হয়েছিল, সেদিন ও ব্যস্তভাবে নেমে এলো ঘর্মাক্ত কলেবরে একটা তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে, বলল আপনি এসে গেছেন, একটু বসুন আমি এখুনি আসছি, নাচ প্রাকটিস করছিলাম—বলতে বলতে যেমন হুড়মুড়িয়ে এসেছিল তেমনিভাবেই চলে গেল। এ যেন বিদ্যুতের ঝলক! কিন্তু ব্যাপারটা বোঝো! আজ

অঙ্ক পরীক্ষা আর উনি প্র্যাকটিস করছেন নাচ! কি করে মেলাই রে বাবা! এ যেন চাইলাম এক গ্লাস জল, এনে দিল আধখানা বেল!

ও পড়ার টেবিলে এসে বসলে সবিনয়ে সে কথাটাই বললাম—পরীক্ষাটা তো অঙ্কের, প্র্যাকটিস হচ্ছে নাচ—ঠিক বুঝতে পারছি না। লাজুক হাসি হেসে ঝলমলি বলল—রোজ সকালে নাচ প্র্যাকটিস না করে আমি থাকতে পারি না, কেমন যেন লাগে!

সেদিন সকালে পড়ার টেবিলে চারটে মোবাইল সাজানো নেই, সম্ভবত সেগুলি ওর শোবার ঘরে, অতএব নির্বিবাদে অঙ্ক কিছুটা হলেও হলো। আমি সহজ ধাঁচের প্রশ্নমালাগুলি— যেগুলি করলে অন্তত পাশমার্ক তোলা যায় সেগুলিই ওকে করাই, সেদিন সেগুলি আরেকবার ঝালিয়ে দিলাম। কি আশ্চর্য! টেস্টে ঝলমলি পাশমার্কের থেকে মাত্র দুনম্বর কম পেল—তাতেই কি নাচ! ঝলমলির নাচ আর ওর বাবা মায়ের নাচানাচি! ওনাদের মেয়ে মন্দিরা জীবনে প্রথম এত্তো নম্বর পেয়েছে অঙ্কে!

ওর নাম মন্দিরা। আমি মনে মনে ওর নাম দিয়েছি ঝলমলি। আমার পঁচিশ বছর বয়সের জীবনে সুখ-দুঃখবহ এ এক অনাস্বাদিত অনুভব।

আমার জীবনেও একটা শখ আছে—মাউথ অর্গান। যদিও এই সিন্থেসাইজারের যুগে ওটা একটা প্রায় অচল বাজনা! আসলে ওটার ওপর আমার লোভ ছোটোবেলা থেকে। প্রথম লোভ ছিল সাইকেল, টিউশনির টাকা জমিয়ে জমিয়ে কি কষ্টে যে একটা সাইকেল কিনেছিলাম! ওটা অবশ্য কাজের জিনিস, টিউশনি করতে সুবিধা হয়। একটু দূরের টিউশনি যেতে তাড়াতাড়ি পৌছান যায়, তাই আমি ওটাকে বলি গাড়ি।

মাউথ অর্গান আমার প্রিয়! প্রিয়তর! প্রিয়তম! অনেক খুঁজে কলকাতার বিদেশি

জিনিসের বাজার থেকে আমি একটা দারুণ মাউথ অর্গান কিনতে পেরেছি। রাত্রে যখন অবসর পাই তখন শুধু পরিচিত গান বাজানো নয়—আমি নতুন নতুন সুর বাঁধতে চাই, হয়তো কিছুই উতরোয় না, তবু গভীর আনন্দ পাই। আসলে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের রাগ রাগিনীগুলি আমি মাউথ অর্গানে বাঁধতে চেষ্টা করি, সফল কতটা হই জানি না, কিন্তু ওই সুরের গভীরতা আমার মনে আনন্দের সঞ্চার করে। এফ. এম. রেডিওয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখানোর একটা অনুষ্ঠান হয়—রাত্রি দশটা থেকে—ওটা শুনে শুনে রাগরাগিনীগুলির সুরের গঠন আয়ত্ত করতে চেষ্টা করি। কিন্তু এসবই আমার নিজস্ব অনুশীলন, এ নিয়ে কোনোদিন কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাইনি...

ঝলমলিদের বাড়ি অবশ্য আমি গাড়ি চালিয়ে যাই না। ওদের বাড়িটা নতুন গড়ে ওঠা যে অভিজাত এলাকায় তার প্রান্তে একটা খাল আছে—খালের এপারে আধা গ্রাম আধা শহর। কাঁচা আর পাকা রাস্তায়, টালির চাল আর পাকাবাড়িতে মেশামিশি। মাঝে মাঝে পুকুর ডোবা বাঁশঝাড়ও আছে। ওই খালের ওপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে, এটা পেরিয়ে অভিজাত এলাকায় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। এ সাঁকোটা নিজেদের গরজে তৈরি করেছে এপারের লোকেরাই। এপারের লোকেরা নানা কাজে আর নানান জিনিসের জোগানে ওপারের অভিজাত এলাকার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে সাইকেল পার করা যায় না। অতএব আমি গাড়ি ছাড়াই ঝলমলিদের বাড়ি যাই।

অত্যন্ত বিরক্ত হলেও আমি ঝলমলিকে কিছু বলি না। রাগে মাথা গরম হয়ে গেলেও নিঃশব্দে তা হজম করতে চেষ্টা করি। ঝলমলি এটা বুঝতে পারে, বুঝে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে যায়, বলে—আচ্ছা স্যার, আপনি আমাকে একটুও বকেন না কেন? —বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে—জানি, জানি, বাবা বারণ করে দিয়েছে, কিন্তু তাও তো মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে বলুন? অন্য সাবজেক্টের স্যারেরা তো একএক সময় রাগ দেখিয়ে—কথা শেষ না করে হি হি করে হাসে, বলে—তবু তো অঙ্কে আমি যতটা মাথা মোটা অন্য সাবজেক্টে ততটা নয়।

উঃ! কি চালাক শয়তান!

তোমাকে বকে কোনো লাভ নেই—অম্লান বদনে আমি বলি—যদি তাতে লাভ হতো, অঙ্ক এগোতো, তাহলে নিশ্চয় বকতাম। উত্তরে ঝলমলি আরও খানিকটা অনাবিল হাসি উপহার দেয়।

ঝলমলির নাচ আমি প্রথম দেখলাম রবীন্দ্রসদনে। না, ও আমন্ত্রণ জানায়নি, তবে চুরি করে বলা যায়! আসলে অনুষ্ঠানটায় প্রবেশ অবাধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত সাত দিন ব্যাপী নৃত্যোৎসব। এই উৎসবে প্রতিভাবান নবীন শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হয়। এতসব আমি জানতাম না, পড়ার টেবিলে একটা অনুষ্ঠানসূচি পড়েছিল, সেটা নিছক সময় কাটাতে আনমনে পড়তে পড়তে দেখলাম 'মন্দিরা সেন' লেখা এক জায়গায়। মনটা সচেতন হয়ে উঠল— তারিখ ও সময় দেখলাম, প্রবেশ অবাধ দেখলাম!

বিনা আমন্ত্রণে যেতে সঙ্কোচ লাগছিল। কিন্তু ও আমাকে কেনইবা আমন্ত্রণ জানাবে! সঙ্কোচ লাগার আরও একটা কারণ— ওর সঙ্গে দেখা হবে না, কারণ ও থাকবে মঞ্চের ভেতরে কিন্তু ওর বাবা মা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব নিশ্চয় অনেকে যাবে, যদি কেউ দেখে ফেলে?

এত সঙ্কোচ সত্ত্বেও কিন্তু না গিয়ে থাকতে পারলাম না। ওর নৃত্য পরিবেশন ছিল অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সময়ে, তাই এাকাডেমি চত্বরে অনেকটা সময় কাটিয়ে অনুষ্ঠান শুরুর অনেকটা পরে সদনে ঢুকলাম। অন্ধকারে বুঝলাম প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ কারণ অনেকে প্যাসেজে বসে আছেন, আমিও বসলাম। উঃ! এই প্যাসেজে বসা অবস্থায় আমাকে যদি ওর বাবা মা দেখে ফেলে? লজ্জায় টিউশনিটা ছাড়তে হবে!

সময় বহে যায়... কে বা কারা নৃত্য পরিবেশন করছে কিছুই বোধহয় দেখছিলাম না, শুধুই অপেক্ষা... অপেক্ষা... অপেক্ষা...! অবশেষে ঘোষিত হলো মন্দিরা সেনের

নাম, তার শিক্ষক, ঘরানা, হ্যানত্যান কত কি! অতঃপর মঞ্চ অন্ধকার, ক্রমশ প্রকাশিত আলো আর যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা... ও কি সেই ঝলমলি? যাকে আমি অঙ্ক শেখাতে চেষ্টা করি? ও তো স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো অপ্সরী... ইন্দ্রের সভা থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে এসে পড়েছে এখানে আমার সম্মুখে... সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ শূন্য মনে হয়... শুধু নৃত্যপরা অপ্সরা আর তার পদতলে বসে আমি... এক ভিক্ষুক...

নৃত্য শেষে ভেঙে গেল স্বপ্ন, অতি দ্রুত বেরিয়ে এলাম, ... আমি কেমন আচ্ছন্নের মতো হাঁটছিলাম... প্ল্যানেটোরিয়াম পেরিয়ে সামনে ইন্দিরা পার্ক—একটা বেঞ্চে অনেকক্ষণ বসে রইলাম...।

শুধুমাত্র ঝড় নয় সাইক্লোন বহে গেছে। তার তাণ্ডব তছনছ করে দিয়েছে আমার অস্তিত্বের শিকড়বাকড়। আর শুধু মুগ্ধতা নয়, আমি বুঝতে পারছি কি গভীর ভালোবাসা বহে চলেছে বন্যার স্রোতের মতো, অথচ বাহিরে কি শান্ত প্রকৃতি! রাখাল বালক সত্যিই ভালোবেসে ফেলল রাজকুমারীকে। কিন্তু আমি তো সরলমতি রাখাল বালক নই, বাস্তবের কঠিন মাটিতে সারাক্ষণ পদযুগল ক্ষতবিক্ষত করে হাঁটতে হয় আমাকে। পিতৃহীন সংসারে মা, বিধবা বৌদি, ভাইপো আর ভাইঝি এদের সকলের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ!

এবং ভবিষ্যতের কথা কিংবা ভাবতে পারি! বাবা মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু করতে পেরেছিলেন, সামান্য একতলা বাড়ি। স্বর্গগত পিতার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দাদা তার সামান্য চাকরি ধরে এগোচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ সব শেষ। পড়াশোনা নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল আমার, এখন ভাইপো ভাইঝির শিক্ষা কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব সেই ভেবেই কূলকিনারা পাই না।

কিন্তু এ কী হলো আমার! এ কী করলাম আমি? না, আমি তো করিনি—ঘটে গেছে—ঝড় তো ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যায় আসে না।

যখন ও সামনে এসে বসে আমার বুকের মধ্যে কেমন এক আলো জ্বলে ওঠে, কি স্নিগ্ধ শান্ত সে আলো! দ্যুতি আছে তাপ নেই। সারাক্ষণ সেই শান্তির আনন্দ নিয়ে সময় কাটিয়ে আমি যখন বেরিয়ে আসি তখনই তিমিরাচ্ছন্ন বিষাদ নেমে আসে বুকের মধ্যে, মনে হয় দুদিন—এখনও দু-দিন অপেক্ষা করতে হবে...। অপেক্ষার শেষে যাত্রা বেলায় কি আকুলতা... অবশেষে পুনরাগমন... কী শান্ত স্নিগ্ধ আনন্দে ভরে যায় দেহ মন।

দিনে দিনে এভাবে আরও অতলে গড়িয়ে যেতে যেতে এক বিনিদ্র রাতে আমি চরম সত্যটা ভেবে ফেললাম—তাই তো! এর আয়ু তো ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত। তারপর আমাকে সরে যেতেই হবে। সেই কথাটা রোজ স্মরণ করলেই হয়! পথিক আমি, চলার পথে যে পুষ্পবতী বৃক্ষচ্ছায়ার শান্তি আর তৃপ্তি পেয়ে গেলাম তাই তো অনেক, এর বেশি তো কিছু চাওয়ার নেই পাওয়ারও নেই। কে এলো কে গেলো কি পেল—এ হিসাব বা অনুভব বৃক্ষের নেই।

কিন্তু আমার বাড়িতে এত মন্দিরা সেনের নাম শোনা যাচ্ছে কেন? ভাইপো ভাইঝি এবং বৌদির উত্তেজিত কী সব আলোচনার মাঝে দেখছি বার বার উচ্চারিত হচ্ছে ওর নাম।

রাত্রে সবাই মিলে আমরা খেতে বসি—আমি আমার ভাবনার মধ্যে—ওদের কী আলোচনা হচ্ছে সেটা খেয়াল করিনি, কিন্তু হঠাৎ মন্দিরা সেনের নামটা শুনে চমকে উঠলাম, খাওয়া ভুলে তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে।

আমার টিউশনি ছাত্রছাত্রী বা তাদের পরিবার সম্পর্কে কোনো আলোচনা আমি বাড়িতে করি না। আলোচনার আছেই বা কি! তাহলে? এরা জানল কি করে ওর নাম?

একটুক্ষণ কান পেতে থাকার পর বুঝলাম আলোচনাটা টি. ভি.র প্রোগ্রাম নিয়ে হচ্ছে। নাচের প্রতিযোগিতার রিয়েলিটি শো-এর আলোচনা।

আমাদের বাড়িতে টিভি একটা আছে। রঙিন টিভিই। কষ্ট করেও কিনতে হয়েছে কিস্তিতে। বস্তুত এন্টারটেইনমেন্টের আর কি বা আছে মা আর বৌদির! যদিও আমার সময় বিশেষ হয় না দেখার। যদিও ভাইপো ভাইঝিকে অনেক বোঝাতে হয়, অনেক সময় টিভি বন্ধ করেও দিতে হয় রাগ দেখিয়ে। কিন্তু এইসব নাচ গানের প্রতিযোগিতার রিয়েলিটি শো ওরা দেখবেই। আজ এইমাত্র শো দেখার পর ওরা খেতে বসেছে। মন্দিরা সেন নাকি অত্যন্ত দক্ষশিল্পী, যেভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে ভাবা যায় না! অসাধারণ! অসাধারণ! বিচারকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন, নম্বরও দিচ্ছেন। বুঝলাম আমার বাড়ির সবাই ওর fan হয়ে গিয়েছে।

শুনে কী আনন্দ, কী আনন্দ! মনে হলো এখুনি বলে দিই তোমাদের ওই মন্দিরা সেন আমার ছাত্রী! কিন্তু না, নিঃশব্দে খাওয়া শুরু করলাম, কানটা কিন্তু ওদের আলোচনায়, বড়ো ইচ্ছা ওর অনুষ্ঠানটা একটু দেখি, পরবর্তী অনুষ্ঠান কবে— শুনলাম সামনের সপ্তাহে চূড়ান্ত বা শেষ পর্ব মঙ্গলবার। আমি ওকে পড়াতে যাই সোম বুধ, শুক্র।

মুগ্ধতার মাত্রা বেড়েই চলেছে। বেড়ে উঠছে ভালোবাসার বন্যা স্রোতে। বাড়ুক, বিপদসীমা ছাড়াতে পারবে না, কাবণ পরীক্ষার পরই তো সব শেষ। কিন্তু এত কিছু মন্দিরা করে কখন! আমি আর ওকে মনে মনে ঝলমলি বলে ডাকতে পারছি না। ও নামটা মনে এসেছিল হালকা মনের উড়ু উড়ু একটা মেয়ের জন্য, ধনী বাবা মায়ের আদুরে একমাত্র সন্তান আদরে আদরে যে—

এখন আর ও নামে ওকে ডাকতে পারি না। যে মেয়ে এতটা অধ্যবসায়ী আর প্রতিভাময়ী! অতএব মন্দিরা! মন্দিরা! মন্দিরা! মন্দিরা! সারাক্ষণ আমার বুকের মধ্যে ঠুন ঠুন ঠুন!

মঙ্গলবার টি. ভি.-র সামনে আমাকে বসতে দেখে পরিবারের সবাই অবাক। ভাইপো ভাইঝি কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত, ওদের প্রতি রাগ করেই আমি বোধহয় টিভির সামনে বসেছি যাতে ওদের উঠে যেতে হয়। কিন্তু এই প্রোগ্রাম ছেড়ে উঠে যাওয়ার

সাধ্য ওদের নেই, তাই ভাইঝি বলল—কাকা, এখন একটা শো হবে যেটা নাচের প্রতিযোগিতার ফাইনাল, তাই—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে তোমরা দেখো, আমি এমনিই বসলাম, আজ একটু ফাঁকা আছি।

শেষ প্রতিযোগিতায় তিনজন প্রতিযোগী...

যে নৃত্যশৈলী আমি রবীন্দ্রসদনে দেখেছিলাম এসব তার কাছে কোথায়? একে তো শুধুই নাচ বলা যায়। কেমন হালকা পলকা! বিজ্ঞাপনের কচকচি আলোর ঝলকানি, বক্তিমের কচকচি এসবের মধ্যে তিনটে যে নাচ আমি দেখলাম এ সব কি? কি জানি, হয়তো ছোটো পর্দায় বলে আমার মনে দাগ কাটছে না, এত মানুষ যখন মাতোয়ারা তখন নিশ্চয় কিছু আছে! তবে তিনজনের মধ্যে মন্দিরাই শ্রেষ্ঠ মনে হলো। তথাপি আমরা দুরু দুরু বুকে বিচারকদের মতামতের অপেক্ষায়। কিন্তু এ কি! প্রথম বিচারক মন্দিরাকেই প্রথম ডাকলেন, হতাশাজনক মুখভঙ্গি করে বললেন—এতদিন ধরে কি অসাধারণ পারফরমেন্স করে আজ তুমি এ কী করলে? ছিঃ! ছিঃ! আসলে পাবলিকের অভিনন্দন পেয়ে পেয়ে তোমার মধ্যে হয়তো অহঙ্কার জমেছে, ভালো করে অনুশীলনও দেখছি করনি, তোমার থেকে আমি আরও বেশি কিছু আশা করেছিলাম। ছিঃ! ছিঃ! এসব বলে বিচারক অন্য দুজন বিচারকের দিকে তাকালেন, যেন তার বক্তব্যের সমর্থন চাইলেন। মন্দিরা হাত তুলে কি যেন বলতে চাইল, ক্যামেরা তাকে বড়ো করে দেখাচ্ছে, মন্দিরার ঠোঁট কাঁপছে ক্রমশ সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, মন্দিরা সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

হই চই গোলমাল, কারা যেন মন্দিরাকে তুলে নিয়ে গেল, বিচারকরা তড়িঘড়ি আরেক জনকে প্রথম ঘোষণা করলেন, এভাবে গোলেমালে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল।

আমার পরিবারের সদস্যরা নিঃশব্দে উঠে পড়ল। আমার ভাইঝির চোখে জল। খেতে বসে আমরা কেউই ভালো করে খেতে পারলাম না। রাত্রে ঘুম নেই, কি হলো মন্দিরার? কি হলো? ও ভালো আছে তো?

পরদিন সন্ধ্যায় পড়াতে যাবার দিন... এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, সকালে খবরের কাগজ বলে দিল সব কিছু—মন্দিরার শরীর অসাড় হয়ে গেছে, কথা বন্ধ, দৃষ্টি ভাষাহীন, এক বিখ্যাত প্রাইভেট হসপিটালে ভর্তি সে, ছবিও বেরিয়েছে।

এ কি হলো? এ কী অন্ধকার নেমে এলো? আমি এখন কী করব? কোথায় যাব? ভিতরে কি ভীষণ অস্থিরতা অথচ বাইরে আমাকে থাকতে হচ্ছে নির্বিকার, আমি পারছি না, খুব খু-ব কাঁদতে ইচ্ছা করছে, বুকফাটা কান্না কাঁদতে পারলে হয়তো একটু শান্ত হওয়া যেত।

একে ওকে জিজ্ঞাসা করে ওই হসপিটালে পৌঁছলাম, এ কি, এখানে একগাদা ক্যামেরার ভিড় কেন? হসপিটালের বন্ধ গেটের সামনে জটলা চলছে, কথাবার্তায় বোঝা গেল অনেকে সাংবাদিক, মন্দিরার দুচারজন বন্ধুও রয়েছে মনে হলো, সাংবাদিকরা প্রবেশাধিকার না পেয়ে তাদেরই নানা জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে লাগল। ইতিমধ্যে এক মহিলা নিজেকে মন্দিরার মাসি বলে পরিচয় দিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিলেন।

—আপনি ওর আপন মাসি? —একজন মহিলা সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন।

—না, মানে ওই আমার মাসতুতো দিদির মেয়ে মন্দিরা—

...কত কথা গল্‌গল্‌ করে বলছিলেন মহিলা!

আরেকদিকে একজন মহিলা ও পুরুষ সমালোচনায় মুখর..., মন্দিরার বাবা মায়ের খুব অহঙ্কার, মেয়ে কি একটু নাচ করেছে তো দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না! এই তো! তেমন হলে ও-ই তো ফার্স্ট হতো!

একটি মেয়ে—মন্দিরার বয়সী—বলে উঠল— মোটেই না, ওকে মিথ্যে মিথ্যে

ফেল করানো হয়েছে, ও-ই সেরা হয়েছিল, নিশ্চয়ই ওই বিচারক টাকা খেয়েছেন। এসবের মধ্যে অনেক দুনম্বরি আছে—

এদের মধ্যে কারো কোনো দুঃখ নেই, বেদনা নেই। এমন একটা দুঃসময়ে মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের ধান্ধায়, এসব সমাগত মানুষেরা এদের কারো মুখে একটুও হা হুতাশ নেই। ভাগ্যিস কর্তৃপক্ষ গেট বন্ধ করে দিয়েছে, নাহলে হয়ত এরা মন্দিরার বিছানার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ত।

গেট সামান্য খুলে একজন সিকিউরিটি গার্ড বেরিয়ে এলেন, বললেন—আপনারা সরে যান, গাড়ি বেরোবে, কেউ ভেতরে যাবার চেষ্টা করবেন না।

গেট অনেকখানি খুলে গেল। ওই তো মন্দিরার প্রিয় সেই লাল গাড়িটা! বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, ভেতরে বসে ওর বাবা ও মা, কি করুণ ওঁদের মুখ! এক পলক দেখেই বোঝা যায় ওরা কত কেঁদেছেন।

সারাদিন আমি কোথাও পড়াতে গেলাম না, যেতে পারলাম না বললেই ঠিক বলা হয়। খাওয়া—সে নামমাত্র। আসলে খিদেই নেই। কেমন একটা অস্বস্তি ভাব ভেতরে। সন্ধ্যা না হতেই ওদের বাড়ি পৌঁছলাম। আজ আমার পড়ানোর দিন, আসাটা স্বাভাবিক, যদি ওর বাবা মায়ের মুখে কোনো খবর পাই।

বাড়ির বন্ধ গেটের সামনেও দেখি জনাকয়েক মেয়ে পুরুষ, ওদের মধ্যে কয়েকজন ক্যামেরাধারী। অবাক লাগে। এরা কি মানুষ? না শকুন?

—আপনারা কি শকুন? —আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—আপনাদের মনে কি একটুও দয়ামায়া নেই?

—এ আবার কে পাগল এলো রে? —একজন মন্তব্য করে উঠল— দেখে দিওয়ানা দিওয়ানা মনে হচ্ছে।

—আমি ওর টিচার—চিৎকার করে বললাম আমি।

—তাই নাকি, তাই নাকি? —বলতে বলতে ওরা আমাকে ছেঁকে ধরল—ক্যামেরা চালু করতে চলেছে বোধহয়, আমি দুহাতে মুখ ঢেকে ছুট লাগালাম।

পরদিন খবরের কাগজের সংবাদ—মন্দিরার অবস্থা একইরকম। মন্দিরার ভাষাহীন অপলক চোখ মুখের একটা ছবিও ছেপেছে।

কি করে এরা এ ছবি ছাপল! কি নিষ্ঠুর এরা! কি করেই বা পেল এ ছবি?' অবশ্য আজকালকার দিনে ছবিতোলা তো খুব সহজ ব্যাপার, মোবাইল ফোনে ছবি তুলে দিয়েছে হয়ত হাসপাতালের কেউ।

একদিন, দুদিন, তিনদিন—মন্দিরার একটু খবরের জন্য আমি পাগলের মতো। না, একগাল দাড়ি নিয়ে ময়লা পোষাক পরা সিনেমার পাগল নয়। বাইরে আমাকে অনেক কষ্ট করেও ঠিক থাকতে হচ্ছে। আমার পারিবারের সবাই আমার ওপর নির্ভরশীল, তারা যেন না বুঝতে পারে আমার ভগ্নদশা।

রোজ সন্ধ্যায় আমি ওদের বাড়ি যাই কিন্তু দারোয়ান আমাকে ঢুকতে দেয় না। মন্দিরার বাবা মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করার জন্য, একটু কথা বলার জন্য আমি কাকুতি মিনতি করি, কিন্তু দারোয়ান কিছুতেই রাজি হয় না, মুখ কাচুমাচু করে বরং বলে —আপনি ওরকম বলবেন না মাস্টারজি, বাবু কাউকেই ঢুকতে দিতে বারণ করেছেন, আপনার লোকেদেরভি নয়। তাছাড়া ওনারা তো বাড়িতেই থাকছেন না, একটু আসেন আবার চলে যান, ওখানেই সবসময় পড়ে আছেন। এটুকু বলতে পারি মন্দিরা দিদি ভালো নেই, একটুও ভালো নেই।

...জনস্রোত আসে যায়... আমি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি... খোলা গেট, অবারিত, ভেতরে যেতে বাধা নেই, কিন্তু ভেতরে গিয়ে আমি কি করব? আমাকে কি মন্দিরার বেড-এর পাশে যেতে দেবে! না, যেতে দেবে না, তাই আমি রোজ আসি, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি, যদি মন্দিরার বাবা মা-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! কিন্তু না, কত মানুষ আসে, কত মানুষ চলে যায়... আমার কাঙ্খিত মানুষের দেখা পাই না, মন্দিরার কথাও তাই জানা হয় না...

এখন কিন্তু সাংবাদিক বা ক্যামেরাওয়ালাদের কোনো ভিড় নেই। তারাও আসে না। তাই বুঝি গেট খোলা। তিনদিন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকি গেটের পাশে,

একদিন সিকিউরিটি গার্ড জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি রোজ রোজ এসে দাঁড়িয়ে থাকছেন কেন? কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ভিতরে যেতে পারেন, রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করুন।

—আমি মন্দিরার খবর চাই, মন্দিরা সেন—আমি সাগ্রহে বললাম।

—ও। সেই বিখ্যাত রোগী? যাকে নিয়ে কদিন খুব হই চই হলো? গেট বন্ধ রাখতে হয়েছিল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, — কেমন আছে ও?

—ওনাকে বোধহয় এখান থেকে নিয়ে চলে গেছে—

—সে কী?

—তাই তো জানি, এখানে খুব জ্বালাতন করছিল টিভি-র লোকেরা, খবরের কাগজের লোকেরা, আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। এত বড়ো হসপিটাল, কত রোগী, তাদের লোকজন—তারা সব কমপ্লেন করছিল। এখানে সব বড়োলোকেদের আনাগোনা—আপনি রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

কোথায় নিয়ে গেল মন্দিরাকে? কি হলো? ব্যগ্র আমি ছুটে গেলাম রিসেপশনে, কিন্তু ওরা কিছুই বলতে পারল না, নাকি বলল না? কি করি এখন? আমি কি পাগল হয়ে যাব? ...মন, স্থির হও... একটু স্থির হও... তোমার ওপর নির্ভর করে আছে সারা পরিবার, এই অস্থিরতা যদি তোমাকে অসুস্থ করে ফেলে? ...তুমি পোড় খাওয়া মানুষ, ছোটোবেলা থেকে কত কষ্ট করে এগিয়ে চলেছ। তুমি মনে কর— তোমার মা বউদি সংসারের কাজের ফাঁকে ঠোঙা তৈরি করে সংসারের সামান্য সুসার করার জন্য, তোমার ভাইপো ভাইঝিকে সামান্য একটু দুধও দেওয়া যায় না পুষ্টির জন্য। আর তুমি কি করছ? এক অলীক মায়ায় আবদ্ধ হয়ে নিজেকে নষ্ট করছে চাইছ! শক্ত হও, মন শক্ত হও...

ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ পথ হাঁটলাম আমি এবং একসময় নিজেকে মন্দিরাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

—এ কী? মাস্টারজি? —দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল।

—আমাকে মন্দিরার খবর বল।

—ওনারা তো এখানে নেই, সবাই কোথায় চলে গেছেন।

—কোথায়?

—জানা নেই, দিদিমণিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন।

— দিদিমণি কেমন? ভালো হয়ে গেছেন?

—না, না, আরও খারাপ, তাইতো চলে গেলেন, ভালো ডাক্তার দেখাতে।

—কোথায় গেছেন? বল, আমাকে বল।

—আপনার শরীর খারাপ মাস্টারজি, আপনি বাড়ি যান। আমরা কেউ কিছু জানি না। লোকজন বড়ো জ্বালাতন করছিল। দিদিমণির আরও ক্ষতি হচ্ছিল। সাহেব, মেমসাহেব একদম পাগল হয়ে গেছেন।

...মন্দিরার বাগানে ফুটে আছে অজস্র গোলাপ, —হাওয়ায় দুলছে, খেলছে, হাসছে... আরও আরও কত ফুল আলো করে আছে বাগান, সবুজ ঘাসের লন তেমনই সবুজ... ওদের মনে কি দুঃখ নেই? ওরা তো একটুও ম্রিয়মান নয়!

—আমাকে একটা ফুল দেবে দারোয়ানজি? লাল গোলাপ?

—ফুল? আপনি ফুল নিয়ে কি করবেন?

—গোলাপ মন্দিরাকে— কি বলব, দাও না একটা।

—আপনি বিলকুল পাগল হয়ে গেছেন—ঠিক আছে, দাঁড়ান, আমি আনছি।

গোলাপ নিয়ে আমি বাড়ি এলাম। গোলাপ মন্দিরাকে নিশানা দিত। দুটি প্লেটে জল নিয়ে আমি টেবিলে রাখলাম, দুরু দুরু বুকে পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলতে লাগলাম, এটায় এক ওটায় দুই... জোড় সংখ্যক পাপড়ি হলে মন্দিরা সুস্থ হয়ে উঠবে... আবার কথা বলবে... আবার ঝলমল করবে... আবার নৃত্যছন্দে মাতিয়ে দেবে...

না, না, গোনায় ভুল হয়েছে... নিশ্চয় ভুল হয়েছে এ হতে পারে না, মন্দিরা সেরে উঠবে, এ কী ছেলেমানুষী করছি আমি এই গোলাপের সামান্য কটা পাপড়ির ওপর কী একজনের জীবন নির্ভর করতে পারে!

তবু আমি আবার গুনতে শুরু করলাম, দুটি প্লেটের পাপড়ি তুলে নিয়ে টেবিলে রেখে... কিন্তু না, সেই বিজোড়... হায়, এ কি হলো, কেন আমি এসব করতে

গেলাম? কি করে এখন মনকে বোঝাব? সহসা এ কি? দেখি টেবিলে একটা ছোট্ট পাপড়ি পড়ে আছে। খুবই ছোট্ট পাপড়ি। আমি পরম যত্নে ওটাকে তুলে নিলাম, আমার আঙুলগুলি কাঁপছে, এ দিয়ে আমি কি বুঝব? এ কি ক্ষীণ আশার আলো?

সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাইরে ঘরে ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে আঁধার। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় গোলাপের পাপড়ি সকল। অন্ধকার ঘরে দুহাতে মুখ ঢেকে আমি বসে থাকি...।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, সহসা ঘরে আলো জ্বললে আমি মুখ তুলে দেখলাম মা দাঁড়িয়ে। কাছে এসে মা কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন। মায়ের দৃষ্টির সম্মুখে আমি অসহায়।

—কদিন ধরে তোকে বড়ো অস্থির দেখছি ছোটোখোকা—মা বললেন—কেমন অসুস্থ লাগছে তোকে, কি হয়েছে রে?

—কিছু না মা—অমি স্বাভাবিক হতে চাইলাম, কিন্তু আমার নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম—এ কি কান্না নাকি হাহাকার?

মা আরও কাছে এসে আমার মাথায় হাত রাখলেন, একটু দীর্ঘশ্বাস, বললেন—জানি বলবি না, কিন্তু মায়ের মন তো! বড়ো কষ্ট পাচ্ছিরে। আজ পড়াতে যাবি না?

—ওই টিউশনিটা আর নেই মা।

—সে কী রে? ওটা তো হাজার টাকার—কিন্তু কি হলো?

—ওরা-ওরা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে।

—ওইজন্য বুঝি তুই অস্থির হচ্ছিস? অবশ্য হাজার টাকার আয় কমে গেলে অসুবিধা হয় বইকি। তা নিয়ে এত চিন্তা করার কি আছে? আবার একটা পেয়ে যাবি। আমার পেনশনের টাকাটা তোলার সময় হয়েছে কিন্তু।

—হ্যাঁ, মনে আছে কাল যাব।

সামান্য কিছু বার্ধক্য ভাতা মা সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন, ওটুকুও একটু সম্বল বইকি।

—চিন্তা করিস না, চিন্তা করিস না—অনেকটা নিশ্চিন্ত গলায় বলতে বলতে

মা বেরিয়ে গেলেন। যাক্ অন্তত মায়ের মনকষ্ট কিছুটা লাঘব হল। কিন্তু আমার? কার কাছে প্রার্থনা করব? শান্তি খুঁজব কার কাছে? ঈশ্বর আমি মানি না। আসলে অনেক প্রণাম ট্রনাম জানিয়ে অনেক মাথা খুঁড়ে পুজো দিয়ে, কিছুতেই জীবনের কোনো আলোকিত পথের সন্ধান পাইনি, অতএব আমি নাস্তিক। অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে নেমে আসছে আরও ঘন অন্ধকার...

দশ দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। কোথাও কোনো সুসংবাদ বা দুঃসংবাদ নেই। জগত সংসার নিজের মতোই চলে। টিউশনিগুলো কোনোরকম চলে, এর ফাঁকে প্রায় রোজই একবার মন্দিরাদের বাড়িতে যাই, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। দারোয়ান করুণ গলায় বলে—চলিয়ে যান মাস্টারজি, বাড়ি যান।

—কোনো খবর নেই দারোয়ানজি?

—না, আমাদের কে কি খবর দেবে মাস্টারজি!

—জিজ্ঞাসা কর না?

—কাকে জিজ্ঞাসা করব? ম্যানেজার সাব আসেন, টাকা দিয়ে যান, ব্যস।

—ম্যানেজার বাবুকে তো জিজ্ঞাসা করতে পার।

—আমার ডর লাগে মাস্টারজি। ইচ্ছা হয় কিন্তু—

হঠাৎ ওপর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল—কার সঙ্গে কথা বলছ দারোয়ানজি?

—মাস্টারজি এসেছেন।

—কোন মাস্টারজি? দাঁড়াতে বল, আসছি।

—কেষ্টদা আসছে—দাঁড়ান মাস্টারজি—

এ কেষ্টদা, মন্দিরাদের বাড়ির নানান দায়িত্ব ওর ওপর। সব কাজেই কেষ্টদার দেখি তদারকি। মধ্যবয়সী মানুষ, কিন্তু খুব চটপটে। দ্রুত ব্যস্ততায় এসে একপলক

দেখে বলল— অঙ্কের মাস্টারবাবু—হ্যাঁ, আপনাকে ম্যানেজারবাবু দেখা করতে বলেছেন। উনি রোজ সকাল দশটার সময় করে আসেন, আপনি কাল হোক পরশু হোক একবার আসবেন। ঘণ্টাখানেক পরে উনি কিন্তু চলে যান, দেরী করবেন না।

যেমন দ্রুত আগমন তেমনি দ্রুত প্রস্থান। কিন্তু ম্যানেজারবাবু কেন ডেকেছেন? আমি রোজ রোজ আসি বলে কিছু বিরক্তি? কিন্তু আমি তো কাউকে জ্বালাতন করি না, একটু খবর, তাও পাই না, ধুর্ আসবই না! কিন্তু যদি কোনো সংবাদ পাই? না হয় দুটো কটু কথা শুনলাম, মারবে তো না! যদি কোনোক্রমে কিছু জানতে পারি? কোথায় আছে মন্দিরা?

পরদিন সকাল সাড়ে নটাতেই হাজির হলাম, দারোয়ান আমাকে নীচের যে ঘরে বসতে দিল সে ঘরে আমি কখনও ঢুকিনি, দেখি এটা একটা ছোটোখাটো অফিস ঘর। অবশ্য মন্দিরার পড়ার ঘর ছাড়া আর কোনো ঘরেই আমি প্রবেশ করিনি। আধুনিক সমস্ত উপকরণ— কম্পিউটার— ওটা বোধহয় ফ্যাক্স মেশিন, ওদিকে দুটো টেলিফোন। ঠাণ্ডা মেশিন চালিয়ে দিয়ে গেছে দারোয়ান, ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে মৃদু শীতল বাতাস। শরীর জুড়িয়ে আসে...

... কিন্তু মন তো জুড়ায় না। এ কেমন যন্ত্রণা! ব্যথা নেই, বেদনা নেই, অথচ যন্ত্রণা। কি এক কষ্ট সারাক্ষণ... এমন কেন হয়? যে মানুষ আমার কেউ নয়, রক্তের সম্পর্ক তো দূরের কথা আত্মীয়ও নয় তার জন্য এমন কষ্ট! আঃ! এমন কষ্ট তো কখনও আমি আমার পরিবারের কারও জন্য অনুভব করিনি।

....কত রাত্রি কেটে যায় কেমন এক তন্দ্রার মধ্যে, অথচ যন্ত্রণা ঠিক জেগে থাকে। গভীর ঘুম কতদিন আমাকে আশ্রয় দেয়নি... কতদিন ক-ত-দি-ন... রাত... ক-ত-রা-ত... আপনি আমাকে কখনও বকেন না... কেন? ...তোমাকে বকুনি দেওয়া মানে নিজের এনার্জি নষ্ট করা... আবার কর... এই সোজা ব্যাপারটা আগে মাথায় নাও—a কিউব মানে a গুণিতক a গুণিতক a, আর a প্লাস a প্লাস a মানে থ্রি a — এভাবেই সব ... a টু দি পাওয়ার ফোর আর ফোর a তফাৎটা না বুঝে রাখলে অঙ্কটা এগোবে না...

...ও কিসের শব্দ? খস্ খস্ শব্দ? এ কী? ঘুম এসেছিল এই শীতল ঘরের আশ্রয়ে! কিন্তু ও শব্দ কিসের? ফ্যাক্স মেশিন চলছে। কাগজটা মেঝেতে পড়ে গেল, আরও একটা—

ফ্যাক্স ছাপা কাগজগুলি কুড়িয়ে তুললাম। সাম্থেরান— ডেট্-টেন-থ্রি-টু থাউজ্যান্ড... ব্যবসা সংক্রান্ত নানা নির্দেশ, কোনোটায় নানা খরচের নির্দেশ— সবই ব্যবসা সংক্রান্ত— শেষে লেখা সোমনাথ সেন। এ কী? এই ফ্যাক্সগুলি পাঠাচ্ছেন মন্দিরার বাবা? তাহলে—তা-হলে ওই যে কাগজগুলির মাথায় লেখা সাম্থেরান—ওটা কি জায়গার নাম? টেবিলের ওপর রাখা অনেকগুলি ফ্যাক্স— ওগুলি উল্টে পাল্টে দেখি। বুকের মধ্যে ভূকম্পন— বেশিরভাগ কাগজের মাথায় একই লেখা—সাম্থেরান— কোথায় জায়গাটা ওখানেই কি মন্দিরাকে নিয়ে আছে ওর বাবা মা?

দরজা খোলার শব্দ। ম্যানেজারবাবু ঢুকলেন।

—এ কী? আপনি এসব কাগজপত্র ঘাঁটছেন কেন?

—না, মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল তাই তুলে রাখছি।

—যাক্ পড়ে, আপনাকে তুলতে হবে না—ম্যানেজারবাবু কাগজগুলি আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন—হ্যাঁ যে জন্য আপনাকে আসতে বলেছিলাম— আপনার গত মাসের মাইনের টাকাটা, এছাড়া আরও তিনমাসের মাইনে আপনাকে দিতে বলেছেন মিস্টার সেন, আপনাকে যেহেতু ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে— বলতে বলতে আলমারি খুলে একটা খাম বার করলেন ম্যানেজারবাবু, আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

—মন্দিরা অসুস্থ বলে আমাকে পড়ানো বন্ধ করতে হচ্ছে—এ পরিস্থিতিতে আমাকে এতগুলি টাকা--- না, না—

—নিয়ে নিন্ মশাই নিয়ে নিন্, টাকা অনেক কাজে লাগে, তাছাড়া আপনি না নিলে এটা ওনাকে জানাতে হবে কেননা এটা আমার ডিউটি, কিন্তু এ অবস্থায় এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি ওনাকে ডিসটার্ব করতে চাই না, ইন্ফ্যাক্ট আপনিও নিশ্চয় চান না?

—ওনারা এখন কোথায়? মন্দিরা কেমন আছে?

—জেনে আপনি কি করবেন? সাংবাদিকদের জানাবেন? যত্তোসব—আপনি আসুন, আমার অনেক কাজ আছে—

বেরিয়ে আসতেই হোলো। হাতে বিনা পরিশ্রমের এতগুলি টাকা বড়ো বাজছে, কিন্তু টাকা এমন জিনিস ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু সা-ন্থে-রা-ন—

রেলের টাইম টেবিলে খুঁজে খুঁজে জায়গাটার নাম পাওয়া গেল। একটি হিল স্টেশন, ছোটো ট্রেন যায়। এত বড়ো দেশের কতটুকুইবা আমি জানি! মন আমার পাখি হতে চায়!

অবশেষে পৌছান গেল। কত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে, সংসারে কত মিথ্যা কথা বলে।

বড়ো ছোট দুরকম ট্রেনে একরাত দেড়দিন কাটিয়ে তারপর পৌছান! ছোটো ট্রেনের পাশাপাশি গাড়ির রাস্তাও আছে। এখানে প্রকৃতি কি মনোরম! কিন্তু আমার মনে বিষাদ।

কিন্তু এরপর? কেন এলাম? কোথায় খুঁজব? আদৌ ওনারা এখানে আছেন কিনা? থাকবই বা কোথায়?

বেশ শীত করছে। ব্যাগ খুলে ধর্মতলার ফুটপাথ থেকে কেনা সেকেণ্ড হ্যান্ড কোটটা বার করে গায়ে দিয়ে নিলাম।

স্টেশনে কাচে বাঁধানো একটা বড়ো বোর্ডে জায়গাটার একটা ম্যাপ টাঙানো, বেশ কয়েকটি হোটেল আর হসপিটাল রয়েছে দেখছি। দুটি ঝরণা রয়েছে আর আছে ভাঙা একটা দূর্গপ্রাসাদ, তারই কাছাকাছি একটি মন্দির। শহরের কেন্দ্রে রয়েছে একটি গির্জা, যেখানে এসে মিলেছে পাঁচ দিক থেকে এগিয়ে আসা পাঁচটি রাস্তা। লোকজন খুবই কম। হয়ত গ্রীষ্মকালে ভিড় হয়। কিন্তু ওই তো কটা মাত্র

হোটেল, কতইবা লোক ধরে! তবে মনে হয় এখানের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি খুব উৎকৃষ্ট আর তাই মন্দিরাকে এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু কোথায় মন্দিরা? মন্দিরা তুমি কোথায়?

একটা ম্যাপ পেলে ভালো হতো। প্ল্যাটফরমে একটা ছোটো বুকস্টল রয়েছে দেখছি।

ম্যাপ কিনতে পাওয়া গেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঢালু রাস্তা নেমে গেছে, হাঁটতে হাঁটতে চড়াই-এর মুখে একটা হোটেল। খুব একটা বড়োসড়ো নয়, ঢুকে পড়া গেল, কিন্তু একা থাকার ভাড়া শুনে ছিটকে বেরিয়ে এলাম, যা টাকা হাঁকল তা আমার পকেট দুদিনে ফাঁকা করে দেবে, খাওয়া তো দূরস্থান!

হোটেলের পর হোটেল, চড়াই উৎরাই নানান পথের ধারে, কি সুন্দর সাজানো বাগান আর রঙচঙে গোছানো বিল্ডিং! ঘুরতে ঘুরতে হাক্লান্ত আমি সবচেয়ে ছোটো কমদামি যে হোটেল খুঁজে পেলাম সেখানে থাকা খাওয়ার সামর্থ্যও আমার নেই। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত বিপর্যস্ত আমি অনুভব করলাম হুট করে বেরিয়ে পড়ার মতো হঠকারিতা করা আমার উচিত হয়নি।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি দারোয়ান ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে যা শোনাল তার মানে এর চেয়ে কমে হোটেল এখানে নেই, আর আমার যা অবস্থা! পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে সে উপদেশ দিল দু'কিলোমিটারের মতো হাঁটলে শহর পেরিয়ে একটা শিবমন্দির পাওয়া যাবে সেখানে একটা ধর্মশালা মতো আছে। যাবার রাস্তাটাও বাতলে দিল সে।

অক্সিজেন! নতুন উদ্যমে হাঁটতে শুরু করলাম।

...রাস্তার ওই বাঁকে হয়তো একটা সুন্দর হাসপাতাল... সামনে রেলিং ঘেরা ফুলের বাগান... তারপর একটা ছোট্ট ব্যালকনি, চেয়ারে বসে আছে মন্দিরা... আমি রেলিং-এর এপাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লাম, হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মন্দিরার ক্লিষ্ট মুখ, ব্যালকনির রেলিং ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল... ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল—স্যার! আপনি এখানে কি করে এলেন?

—সে অনেক বাধা পেরিয়ে অনেক কষ্টে এসেছি মন্দিরা।

—কেন? কেন?

—কেন বুঝতে পারছ না? তোমাকে দেখতে। আহ্! সুস্থ হয়ে উঠেছ তুমি, কথা বলছ, আজ আমার কী আনন্দ! আমি কতদিন ঘুমাইনি মন্দিরা, আজ আমি খুব ঘুমাব, খুব, খু-উ-ব...

পথের বাঁক ঘুরে দেখলাম একটি বাগান ঘেরা ছোট্ট বাংলো ধরনের বাড়ি, গাছপালায় জল দিচ্ছেন এক বৃদ্ধা মহিলা।

হাঁটতে আর পারছি না। স্টেশনে জলের বোতল ভরে নিয়েছিলাম—ওই চলছে। এক প্যাকেট বিস্কুটও যদি কেনা যেত! কিন্তু এখানে কলকাতার মতো যেখানে সেখানে দোকান নেই। হয়ত মার্কেট ছাড়া পাওয়া যায় না। মার্কেটই বা কোথায়? আচ্ছা হোটেল খুঁজেছি কিন্তু হসপিটাল? নার্সিং হোম? হোটেল খুঁজতে ব্যস্ত আমি আর কিছু খুঁজিনি। হয়ত পেরিয়ে গেছি মন্দিরার ঠিকানা! ক্রমশ জনবিরল হয়ে আসছে পথ, ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে বসতি। শুধুই গাছপালা, দূরে দূরে এক একটা বাড়ি। আর যে পারছি না মন্দিরা! কোথায় আছ তুমি? ভালো আছ? তুমি ভালো থাক মন্দিরা! তুমি আবার ঝলমলি হয়ে ওঠো। ওই বোধহয় দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়া। ওখানে পৌঁছালেই কি আমি পেয়ে যাব শান্তির আবাস? ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর কী মন্দিরে থাকেন? আমার ইদানিং মনে হয় ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেননি, মানুষই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। এক এক মনোভাবের মানুষ তৈরি করেছে এক এক ধরনের দেবতা। সে যাইহোক ওখানে অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁই যদি পাওয়া যায়, আর একটু খাবার—যাহোক কিছু। কি নির্জন আর বৃক্ষ নিবিড় এই পথ। ক্রমশ আমি যেন এক অরণ্যে হারিয়ে যাচ্ছি...।

পথ এখানে দুভাগ হয়ে গেছে। এবার কোন দিকে যাব? মন্দিরের চূড়াও গাছপালার আড়ালে। সম্ভবত এই দুটি পথের একটি গেছে ভগ্ন প্রাসাদের দিকে, আরেকটি মন্দিরের দিকে। এখন কোনদিকে যাই?

সহসা গুরু গুরু ধ্বনিতে বেজে উঠল কেমন এক বাদ্য, সঙ্গে গান, দূর থেকে ভেসে আসছে, ভরাট আর সুরেলা পুরুষ কণ্ঠের রাগাশ্রয়ী গান। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘণ্টাধ্বনি, দেবতার বন্দনা গান। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ডানদিকের পথে ধরে

এগিয়ে চললাম। এখানে পথ ক্রমশ উঁচুতে উঠেছে, পা আর চলছে না, তবু চলেছি।

তারপর আমার সম্মুখে বিশাল এক প্রাচীন মন্দির। মন্দির চত্বরের ওই প্রান্তে গর্ভগৃহের সম্মুখে বসে পাখোয়াজ বাজিয়ে সংস্কৃতে গান করছেন এক বৃদ্ধ, পরনে গেরুয়া বসন, তাঁর সাদা চুলে ভরা মাথা তালে তালে দুলছে। ছাদ থেকে ঝোলান ঘণ্টা দড়ি টেনে টেনে তালে তালে বাজাচ্ছে এক কিশোর। আমি স্তম্ভে হেলান দিয়ে বললাম।

গান শেষ হলো, সাধুজি উঠলেন, প্রসাদের থালা তুলে নিয়ে ফিরলেন, অবাক হয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না, কেঁদে ফেললাম, ইশারায় জ্যনাতে পারলাম আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। প্রসাদ সামান্য তার সবটুকুই আমাকে দিলেন তিনি। বুভুক্ষুর মতো সেটুকু খেয়ে জল পান করে স্বর ফুটল, আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। ভাষা একটা প্রতিবন্ধক, কোনোক্রমে বোঝালাম আমি কত অসহায়।

পাথরের ছোট ঘর। সাধুজি আগে ঢুকলেন, সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন, পিছনে আমি। ছোটো দরজা, একটিমাত্র ছোটো জানালা, তাও বন্ধ। কম পাওয়ারের বাল্ব—তাও ধূলোময়লায় ধূসর। স্বল্প আলোয় দেখলাম ঘরে একটি তক্তাপোষ ছাড়া আর কিছু নেই। ব্যাগ রেখে বসলাম। আশ্রয়! স্বস্তি!

অন্ধকার নামছে। ঠাণ্ডা বাড়ছে। ওদিকে জলের ট্যাপ বাথরুম এসব আছে জানালেন সাধুজি, বিছানা নেই এ ও জানালেন। তবে একটা কম্বল দিলেন। একটা চাদর এনেছি, আধখানা কম্বল বিছিয়ে চাদরটা গায়ে দিয়ে কম্বলের বাকি অংশ তার ওপর জড়িয়ে নিয়ে ব্যাগ মাথায় দিয়ে গুটিশুটি শুয়ে পড়লাম। আমার পঁচিশ বছরের জীবনে এমন শয্যায় কখনও শুইনি। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে তবু কি আরাম! আয় ঘুম... আয় ঘুম... আয়...।

তিনদিন কেটে গেল কেমন ঘোরের মধ্যে। স্নান নেই, খাওয়া যৎসামান্য, সকালে উঠে বেরিয়ে পড়ি। আমার আবাসস্থল শহরের বাইরে। প্রায় দু কিলোমিটার হেঁটে তবে শহরে পৌছান যায়, তারপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। হসপিটাল হয়ত গুটিকয়েক, কিন্তু নানান দিকে। আর পথ—চড়াই উৎরাই। ঘুরে ঘুরে বেলা যায়, পা টেনে টেনে ফিরে আসি। তখন সন্ধ্যারতি করেন সাধুজি, গান করেন। ওই উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠ—আর ঘণ্টাধ্বনি! কী এক পরিমণ্ডল তৈরি করে! শুনতে শুনতে চোখে জল আসে। কেন জানি না। দুর্বল শরীর, দুর্বল মন, একটা করে দিন পেরিয়ে কেমন এক জড়তা আমার ওপর আরও আরও চেপে বসছে। কিন্তু কোথাও কোনো আলো নেই। মন্দিরা সেন নামে কোনো রোগী কোনো হসপিটালেই পাওয়া গেল না। আর কি!

সন্ধ্যারতির পরে সাধুজীর সঙ্গে দুচারটি কথা হয়। আসলে উনিই প্রশ্ন করে করে জেনে নেন। আমি যে এক অসুস্থ আত্মীয়ের খোঁজে এসেছি এটা ওঁকে বলেছি। রোজই, ফিরে ওনার প্রশ্নের উত্তরে খুঁজে না পাওয়ার কথা বলি। উনি আমার কষ্ট অনুভব করেন, তারপর বলেন ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখো। একান্ত মনে প্রার্থনা করতে বলেন, বলেন—আকুল প্রার্থনা অবশ্য সফলতা আনবে। আমি মনে মনে হাসি! আমার পঁচিশ বছর বয়সের জীবনে আমি এটা বুঝেছি—জীবন যখন মসৃণ পথে চলে তখন মানুষ নিজের উদ্যম আর শক্তির ওপর আস্থাশীল, তখন সে শুধু হাঁটে না, হাওয়ায় ভাসে! কিন্তু যখন বাধায় বাধায় বিপর্যস্ত জীবনের পথ, তখন? তখন তাবিজ কবচ মাদুলি, তখন ঠাকুর দেবতা জ্যোতিষ, তখন ওটুকু বিশ্বাস—সন্ধ্যায় দেবস্থানে বাতি দিলেই বোধহয়—তারপর এসব বিশ্বাস করতে করতেই যখন আরও আরও বিপর্যস্ত জীবন—তখন মানুষ অবিশ্বাসী। সতরাং আমি অবিশ্বাসী। আমি ওসব অনেক করেছি সাধুজী! —মনে

মনে বলি আমি, কিন্তু নীরবে ওনার কথা মেনে নিই। আশ্রয়দাতা উনি, দয়াময়ও। রাত্রে রুটি সব্জি ভোজন করাচ্ছেন। আমার জন্য প্রার্থনাও করছেন। উনি দয়ালু মানুষ।

ওই কিশোর ঘণ্টাবাদক—ও এক অনাথ বালক। ওকে কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন—তখন ওর বয়স বছর তিনচার। ওকে রোজ সন্ধ্যাবেলা পড়াতে বসেন। ওনার সংস্কৃত উচ্চারণ অনবদ্য। সঙ্গীতেও তালিম দেন—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। একটু তফাতে বসে আমি শুনি, মন কিছুটা শান্ত হয়।

আরও একটা দিন কেটে গেল, আরও একটা রাত। শরীর আরও জবুথুবু। বস্তুত আর খোঁজার মতো কোনো জায়গাও নেই। কিন্তু আমার মন বলছে মন্দিরার কাছাকাছি আমি আছি। অথচ দেখা নেই। তবে কি ফিরে যেতে হবে? আজ শরীর আর বইছে না। অনেকটা বেলায় উঠলাম।

মন্দির চত্বরে রোদ এসে পড়েছে। কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! দুটি মাত্র প্রাণী। দুটি কেন— দেড়জন বলা যায়। কিভাবে পরিশ্রম করে! পরিবর্তে কি পায়? পার্থিব কিছুই তো পাবার নেই।

পায়ে পায়ে মন্দির চত্বরে এসে বসলাম। উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এলেন সাধুজি, শরীর খারাপ কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। বুঝতে পারলাম আমাকে দেখে খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে। হওয়া স্বাভাবিক, মলিন বেশবাস, রুক্ষ চুল, দাড়ি কামানো হয়নি সপ্তাহখানেক, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবিক কষ্ট আর শারীরিক দুর্বলতা। পা দুটো ব্যথায় আড়ষ্ট।

দেবতার চরণে সব কষ্ট সঁপে দিতে বললেন সাধুজি, একমনে প্রার্থনা করতে বললেন।

আমি উদাস চোখে গর্ভগৃহের দিকে তাকালাম। এই কষ্ট আমি আর বহন

করতে পারছি না। এ আমার কি হলো। কোথায় ঘরবাড়ি, কোথায় প্রিয় আপনজনেরা। কতদূরে এসে পড়ে আছি। কিভাবে আছি। ফিরে যাবার মতো শক্তিও নেই। এখানে এতদূরে আমি কি এভাবে শেষ হয়ে যাব? অথচ যার জন্য এত তার মনের কোণে আমার জন্য সামান্যতম জায়গাও নেই। আমার চোখ জলে ভরে গেল, দৃষ্টি ঝাপসা, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। দেবতা যদি থাকেন তাহলে থাকুন তাঁর গৃহে।

সিঁড়ি দিয়ে কারা যেন উঠে আসছেন, দুজন মানুষ—একজন পুরুষ একজন নারী।

—পুজারী আছেন?

—কে? —আমি চমকে তাকালাম, কাদের দেখছি!

—কে আপনি? —প্রশ্নকর্তা আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, বোধহয় চিনতে পারলেন, কিন্তু বিশ্বাস করা শক্ত তাই বললেন— তুমি—তুমি—

—হ্যাঁ আমি, মন্দিরা কোথায়? কেমন আছে? —ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম।

—কিন্তু তুমি এখানে এভাবে—বললেন মন্দিরার বাবা।

—কি আশ্চর্য! —বললেন মন্দিরার মা।

—মন্দিরা কেমন আছে? আমি তাকে কত খুঁজছি, পাইনি, কেমন আছে মন্দিরা?

—তুমি কি মন্দিরার খোঁজে এখানে এসেছ? কে তোমাকে খবর দিয়েছে? কেউ কি তোমাকে পাঠিয়েছে? কি জন্য এসেছ?

—এত দূরে পালিয়ে এসেও লুকিয়ে থাকা গেল না— বিড় বিড় করে বললেন মন্দিরার মা—আবার ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, শুরু করবে অত্যাচার।

—বিশ্বাস করুন কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি, আমাকে কেউ পাঠায়ওনি এখানে, শুধু মন্দিরার একটু খবর পাওয়ার জন্য, তাকে সুস্থ দেখার জন্য—আর কিছু নয়।

—ক্যারে বেটা, মিল গ্যয়া তেরে মঞ্জিল? —সাধুজি কখন যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, ফিরে দেখলাম ওনাকে, হাসছেন।

—সাধুজি, আমরা আমাদের মেয়ের জন্য প্রার্থনা করতে এসেছি, ওর বড়ো অসুখ। —আকুল স্বরে বললেন মন্দিরার মা।

—উসি লিয়ে এ লেড়কা ভি পাঁচ দিন সে শিউজিকা চরণমে পড়া হুয়া হ্যায়। অউর হাম রোজ সুবা আউর সাম তুমহারা লেড়কিকো আরাম কে লিয়ে পূজা করতা হ্যায়।

—কিন্তু সাধুজি, ওঁরা বলছেন মন্দিরা ভালো নেই।

—একটু ভালো—বললেন মন্দিরার বাবা, কেমন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

—যে অবস্থায় নিয়ে চলে এসেছিলাম তার থেকে একটু ভালো, চোখে ভাষা ফিরেছে, সামান্য কথা বলছে, বললেন মন্দিরার মা।

মন্দিরের পিছনে একটু নীচে নেমে গেলে একটা উষ্ণজলের পবিত্র কুণ্ড আছে, ওখানে স্নান করে পূজা দিতে হয়—জানালেন সাধুজি। কিন্তু ওনাদের সঙ্গে স্নান করার জন্য কিছু নেই।

আমরা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি, —ব্যাগ্রভাবে বললেন উনি—আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে, নীচে রাস্তায়।

সাধুজি অনুমতি দিলেন। ফিরে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন মন্দিরার মা, বললেন—তুমিও ততক্ষণে স্নান করে নাও, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার। আমরা একসঙ্গে পুজো দেব।

হঠাৎই যেন বইছে কেমন দখিনা বাতাস, শরীর থেকে ঝরে যায় ক্লান্তি, অবসাদ, বুকের মধ্যে ঝরে কেমন ঝরণাধারা, ধুয়ে দেয় যন্ত্রণা, কষ্ট। উষ্ণ জলের কুণ্ড—এও এক উপহার হয়ে এল আজ। এতদিন আছি জানাননি সন্ধান। তাছাড়া আমি রোজ সকালে বেরিয়ে যাই।

কী গভীর তৃপ্তিতে স্নান করলাম! কি আশ্চর্যভাবে সুস্থতা সবলতা ফিরে আসছে। প্রকৃতির কি আশ্চর্য সৃষ্টি। শহর জুড়ে দেখছি আছে জলের পাইপ লাইন, এ মন্দিরেও। পাহাড়ের আরও উঁচুতে হয়ত কোনো ঝরণা সে জলের জোগানদার—সে জল কি ঠাণ্ডা! আবার এই পাহাড়েরই একধারে রয়েছে এমন উষ্ণজলের ধারা।

চারপাশ পাথরে বাঁধান কুণ্ড, হাঁটুর ওপর মাত্র জলের গভীরতা। কুণ্ডের একধার দিয়ে বেরিয়ে আসছে উষ্ণ জলের ধারা আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। জলে কেমন খনিজ গন্ধ। একটু দূরে দূরে সব বড়ো বড়ো গাছেরা ক্রমশ নিবিড়। কি মনোরম পরিবেশ! গভীর নৈশব্দের মাঝে ঝংকার দু-একটি পাখির ডাক। চোখে কেন জল আসে বারবার, ফিরে আসে বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা!

সাতদিনের পরা পোষাক ছেড়ে পরিষ্কার পোষাক পরলাম। মন্দির চত্বরে যখন এসে বসলাম ওনারা এলেন, কিশোর ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর আমরা তিনজন বসেছি, সাধুজি পূজা করেছেন, আমরা প্রার্থনা করেছি। তারপর গাড়িতে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে, যত এগিয়ে চলেছি তত উত্তেজনা।

—কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না কে তোমাকে খবরটা দিল। ম্যানেজারবাবু? কিন্তু উনি বলবেন বলে তো বিশ্বাস হয় না!

—না উনি বলেননি—দৃঢ়স্বরে বললাম আমি—আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনাদের কোনোরকম ডিসটার্ব করব না, শুধু ওকে দেখে ফিরে যাব, কাউকে কিছু বলব না।

—এ ছাড়া জানে যারা পৌছে দিয়ে গেছে—ডাক্তার মুখার্জি, আয়া, নার্স আর এ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার—ওদেরই কেউ বলেছে নিশ্চয়। উঃ! ওদের এত টাকা দেওয়া হলো।

—আপনি বিশ্বাস করুন, কেউ বলেনি।

—কি থেকে কি যে হয়ে গেল! —উদাস গলায় বললেন মন্দিরার মা—আমরাও বড়ো লোভী হয়ে পড়েছিলাম, নামের লোভ, আর সেজন্য আমরাও হয়ত ওর ওপর অজান্তে চাপ সৃষ্টি করে ফেলেছি।

—সে কী? সবাই তো জানে বিচারকের তিরস্কারেই—

—হ্যাঁ, তাই, কিন্তু তার আগে কদিন ধরে আমরাও বড়ো বেশি—

—একটা জিনিস আমি বুঝতে পারি না—এইসব চটুল ফিল্মি গানের সঙ্গে ফিল্মের নকল করে চটুল নাচ-এর মধ্যে প্রতিভার কি বিকাশই বা দেখা সম্ভব? —বললাম আমি, আমার বলার মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ উষ্মা—আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না, —নিভে যেতে যেতে মনে মনে বললাম এখন আমি শুধু মন্দিরাকে দেখতে চাই, আর কিছু না, কিচ্ছু না, ওদের বিরুদ্ধে কিছু না বলাই ভালো।

—না না, ঠিকই বলেছ তুমি, আমরা এখন সেটা বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা কি হলো ও যখন প্রতিযোগিতায় নাম লেখাল আর একটা শোতে উতরে গেল তখন আমরা অত কিছু ভাবিনি, কিন্তু যখন একটার পর একটা বেড়া পার হতে থাকল আমরাও লোভী হয়ে উঠলাম। শেষে যখন ফাইনালে—তখন আমরা একেবারে আত্মহারা, প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস—আমরা অজান্তে নির্মম হয়ে গেছি, সামান্য অবহেলাতেও বকাঝকা করেছি, শরীরে মনে ও যে দুর্বল হয়ে পড়ছে আমরা খেয়ালই করিনি।

—তাই? উঃ! — বেদনায় হতভম্ব আমি কাতরোক্তি করে উঠলাম। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

—আমরা যে কতখানি অপরাধী—ফুঁপিয়ে উঠলেন মন্দিরার মা—কি করে এর প্রায়শ্চিত্ত করব জানি না, কিন্তু তুমি ওর ভালোর জন্য অতদূর থেকে এসে এভাবে এ অবস্থায় দেব-মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়ে আছ! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমার প্রার্থনাতেই মন্দিরা সুস্থ হয়ে উঠছে।

—না! না! —প্রতিবাদ করতে চাইলাম আমি, মনে মনে বললাম হে ঈশ্বর এ যে কতখানি ভুল ধারণা—কিন্তু আমার আকুলতা আমার কষ্ট সে তো ভুল নয়—বুকের মধ্যে কে যেন বলে উঠল।

গাড়ি একটা বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকছে। কি আশ্চর্য এখানেও আমি খুঁজে গেছি, মন্দিরার এত কাছে এসে ফিরে গেছি, এরা বলেনি, হয়ত বলা নিষেধ আছে।

... সে ঝলমলির সামান্যটুকুও নেই...

...আমি কি কেঁদে ফেলব? না না, আমাকে এত দুর্বল করে দিও না ভগবান...

ঘুমিয়ে আছে মন্দিরা।

—মন! —মা ডাকলেন।

চোখ মেলল।

—দ্যাখ্ কে এসেছে।

উদাস চোখে কি সামান্য উজ্জ্বলতা?

—স্যার—

আমি ওর সামনের চেয়ারে বসলাম, চোখের জল আর বাধা মানল না।

—আপনি কাঁদছেন স্যার! —কী ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মন্দিরার—আপনি আমাকে কখনো বকেননি, কখনো না—

চোখ বুজল। চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

—কেউ তোমাকে আর বকবে না, তুমি ভালো হয়ে ওঠো।

—কিন্তু আমি যে পারলাম না, হেরে গেলাম।

—তুমি হারোনি, সবাই জানে তুমিই প্রথম, তোমাকে অন্যায়ভাবে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব কথা তুমি কেন ভাবছ?

—ওটাই মুশকিল, —মা বললেন—ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না, আর সেজন্যই সেরে উঠতে পারছে না।

—কী একটা সামান্য টিভি চ্যানেলের সামান্য চটুল নাচের প্রতিযোগিতা—তাকে তুমি বড়ো বেশি মূল্য দিয়ে ফেলেছ, ওগুলো কি নাচ? তোমার আসল নাচ তো আমি দেখেছি, রবীন্দ্রসদনে—

—দেখেছেন? —খুলে গেল বন্ধ চোখের পাতা।

—দেখেছি অপূর্ব। ওই তো আসল নৃত্যশৈলী মন্দিরা!

—তাই? —দীর্ঘশ্বাস।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই, বিশ্বের দরবারে ওরই মূল্য মন্দিরা, আর এসব চটুলতায় ভুলো না, সত্যিকার শিল্পী হওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে।

—আপনি বলছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি।

—আপনি তো আমাকে সবসময়ই ওরকম বলেন। যতবার ভুল করি ততবার বলেন পারবে পারবে আবার কর! —বালিকার মতো আদুরে গলা।

—পারবেই তো!

—না, আর আমি নাচতে পারব না, আমার হাত পা অসাড় হয়ে গেছে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার তোমার মনের জোর, সেই জোরেই সেরে উঠবে তুমি, শুধু চিকিৎসায় নয়। ভুলে যাও, তুচ্ছ ওসব কথা ভুলে যাও।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, অনেক কথা বলেছে ও, আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। চোখ বুজিয়ে নিয়েছে।

—আসছি আমি।

চোখ মেলল—আবার আসবেন—বালিকার মতো সেই আদুরে গলা। চোখ বুজল।

কি নির্দেশ! কি করব আমি?

—তুমি যেও না অনুপম, থাকো—মৃদুস্বরে বললেন মা।

—হ্যাঁ থাকো! —সমর্থন।

নার্স এসে জানাল এবার যেতে হবে, রোগীর স্নান খাওয়া—

—এখানে একটা ভালো ক্যান্টিন আছে, চল আমরাও খেয়ে নিই।

—তুমি এখানে এভাবে আছ!

তক্তাপোষে পাতা একটি মাত্র কম্বল, সুতির চাদরটা পড়ে আছে এলোমেলো, একদিকে ব্যাগ—ওটা আমার মাথার বালিশ, তার পাশে জলের বোতল। ছোটো জানলাটা খুলে দিয়েছি, তেরছা হয়ে রোদ পড়েছে তক্তাপোষে।

ওনারা আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিতে এসেছেন, দেখতে চেয়েছেন আমার আস্তানা।

—এত কষ্ট করে—

—আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

—খাওয়া দাওয়া?

—ও চলে যাচ্ছে একরকম।

—সত্যিই তুমি মহান।

—এভাবে বলবেন না।

—অনুপম, আমরা দুজনে একা বড়ো অসহায় বোধ করছিলাম, নিজেদের অপরাধ সেও বড়ো যন্ত্রণার। মেয়ের মানসিক কষ্ট, আমাদের মানসিক কষ্ট সব মিলিয়ে একটা দমবন্ধ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আজ এই একটা বেলায় কি যে ঘটে গেল! কেমন relief। কিভাবে দু একটা মাত্র কথায় ওকে তুমি বোঝালে! মনে হচ্ছে ওর মনটাও একটু হালকা হয়েছে। তক্তাপোষের একধারে ওরা বসলেন।

—সবই ভগবানের দয়া। বললাম আমি। কি আশ্চর্য বিশ্বাসে বললাম, নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

—তোমার এই গভীর বিশ্বাস আমাদের সহায় হোক, তুমি বোসো—আমি জানলার কাছে বসলাম। বাইরে নির্জন অরণ্যে দীর্ঘ সব বৃক্ষেরা ফিসফাস করছে। বিশ্বাস ফিরে আসছে, ভালোলাগা ফিরে আসছে, ভালোবাসা মধুর হয়ে উঠছে!

—তুমি বিশ্রাম কর, আমরা আবার সন্ধ্যার সময় আসব।

—ভালো থাক বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন—বললেন মা।

ওনাদের কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গেছে আমি মন্দিরার মঙ্গল কামনায় মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়ে আছি। আসলে কোনো বিশ্বাস নিয়েই এখানে আসিনি, বাধ্য হয়েছি থাকতে, এটা বোঝাতে গেলে—কিন্তু কারণটা যাই হোক কৃচ্ছ্রসাধনটা তো সত্যি! কে আনল এখানে আমাকে? নিজের ইচ্ছায় সবকিছু হয় না— কে যেন বলল মনের মধ্যে—অনেক কিছু ঘটে যায় অদৃশ্য সেই শক্তির ইচ্ছায়, নিরাশ্রয় আমি, অসহায়, শরীরে মনে কি কাতর, প্রথম সে দিন মন্দিরের দ্বারে এসে বসে

চোখের জলে ভেসে সেই আত্মসমর্পণ? আর শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়াই তো তাঁর কাজ। আর, সারাক্ষণ মনে মনে মন্দিরার সুস্থতা কামনা করেছি। তাকে দেখার জন্য আমার মনপ্রাণ একাগ্র। নিজের মনের সবটুকু কি নিজেই জানা যায়! ফিরে আসছে বিশ্বাস, ফিরে আসছে আনন্দ ওই উষ্ণ প্রস্রবণের মতো... ঘুম পাচ্ছে, শান্তির ঘুম...

...ওই পাহাড়ের ওপর থেকে কে যেন ডাকছে, ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে, ঝরণা নেমেছে ওপর থেকে, ঝরণার পাশে শুয়ে আছি, ডাক শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু সাড়া দিতে পারছি না, চেষ্টা করছি, তবু হাত পা নাড়াতে পারছি না। ক্রমশ ডাক স্পষ্ট এবং জোর—ঘুম ভাঙল। কী গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলাম। উঠে বসলাম। ওনারা এসেছেন। একটা কম্বল আর একটা বালিশ তক্তাপোষে রাখলেন, বললেন—এটা রাখো।

অনেক জিনিস এনেছেন ওরা, চাল, ডাল, আটা সব্জি—কত কিছু।

—ইত্‌না চিজ্ কিঁউ লায়া?

—এ সামান্য কিছু, আপনাদের সেবায় লাগবে—হাত জোড় করে বললেন মা।

সাধুজি খুঁত খুঁত করতে লাগলেন, আমরা কি সংসারী মানুষ এতসব রান্না করব! এত সব গুছিয়ে রাখবই বা কোথায়?

ওঁরা কুণ্ঠিত মুখে জোড়াহাত করে দাঁড়িয়ে। সাধুজি দেখলেন, বললেন,—এ ছোটে মহারাজ, ইধর আ, রাখ দে সব—স্বস্তিতে ভরে গেল ওঁদের মুখ।

সাধুজি বসলেন, সকলকে বসতে বললেন। আমরা বসলাম। এই নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ, এই পরিচ্ছন্ন মন্দির চত্বরে বসলে মনটা আপনিই কেমন শান্তিতে ভরে যায়। সকলে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলাম। সাধুজি চোখ বুজে আছেন, কি যেন

ভাবছেন, হঠাৎ বললেন—ওকে রোজ কুণ্ডের জলে কিছুক্ষণ রাখতে পার?

—এখানে! ওই উষ্ণ কুণ্ডে! আমরা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম, ওর ওই অসাড় শরীরে, এই উষ্ণ খনিজ জলের ধারা বিশেষ কিছু ক্রিয়া করতে পারে, কিন্তু ওরা কি সেটা মেনে নেবেন, নাকি ডাক্তারবাবুরা এসবে অনুমতি দেবেন। তাছাড়া এখানে নিয়ে আসা, যেখানে গাড়ি রাখা যায় সেখান থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে মন্দির চত্বর, এখান থেকে আবার কিছুটা নেমে তবে উষ্ণকুণ্ড—কিভাবে এতসব করা যাবে।

সবাই চুপচাপ যে যার মতো ভাবছিলাম। সাধুজি উঠলেন, সন্ধ্যারতির জোগাড় করতে হবে বললেন।

সাধুজি প্রথমে আরতি করেন, পরে পাখোয়াজ বাজিয়ে গান করেন। সংস্কৃত এই গান সম্ভবত সামবেদের গান। ধ্রুপদী এ গানের সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছি মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ এরকম অনেক গান একই সুরে বাংলায় করেছেন। আজ আমি আমার মাউথঅর্গান ব্যাগ থেকে বার করেছি। কিছু না ভেবেই আমার এই একান্ত আপন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। গান শুরু হলো, শুরু হলো তালে তালে ঘণ্টাধ্বনি, আমি আমার অর্গানে সুর মিলিয়ে সুর তুললাম। বড়ো ভালো লাগছে!

পরদিন ওঁরা যখন এলেন ওঁদের খুব চিন্তিত দেখা গেল। বললেন—সকালে ডাক্তারবাবু বলেছেন রোগী এখন যে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে তাতে হসপিটালের কেবিন ভাড়া করে রাখার দরকার নেই, কেননা রোগীর এখন দরকার শুধু সুষ্ঠু পরিচর্যা নিয়মিত ওষুধ খাওয়ান আর ফিজিওথেরাপি, সেটা বাড়িতে রেখেও করা যেতে পারে। একজন আয়া রেখে দিলে হবে, আর ভালো ফিজিওথেরাপিস্ট একজনকে নিয়মিত ব্যবস্থা করতে হবে, যেমনটি এখন চলছে।

—কিন্তু এ অবস্থায় কি করে ওকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব? তাছাড়া যদি অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দেয় কিভাবে কি করা হবে?

—এখানে একভাবে চিকিৎসা হলো, ওখানে আবার কোন ডাক্তার দেখবেন?

—কিন্তু ওনারা কেবিনে আর রাখতে চাইছেন না, বলছেন অন্য জরুরী অবস্থার রোগীর জন্য দরকার।

—এখানে ফিজিওথেরাপি চলছে বুঝি? —আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রায় গোড়া থেকেই নিয়মিত।

—আপনাদের হোটেলে যদি রাখেন আর ওই ফিজিওথেরাপিস্ট যদি নিয়মিত আসেন।

—হোটেলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রোগী রাখা সম্ভব নয় বলল, তাছাড়া ওর পথ্য— হোটেলের খাবার কি আর ওর চলবে!

ওরা কুণ্ড স্নান করে এলেন, আজও আমরা প্রার্থনায় বসলাম। সাধুজি প্রসাদী ফুল দিলেন।

—কুণ্ডে স্নান করে নিজেদেরই কেমন শরীরটা ভালো মনে হচ্ছে, তাই না, বলো—মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—ঠিক তাই— বললেন মন্দিরার বাবা।

—আচ্ছা, এটা তো টুরিস্ট স্পট, এখানে কটেজ ভাড়া পাওয়া যায় না? —আমি।

—তাই তো, এটা তো ভাবিনি! এরকম কিছু পেলে তো সব ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়।

—দেখুন দেখুন।

—তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে? কেমন অসহায় লাগছে, মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে না। আসলে আমি তো শুধু নির্দেশ দিই, কাজটা করে সবাই!

—যাব নিশ্চয়ই যাব—বললাম আমি —দাঁড়ান সাধুজিকে বলে আসি।

—হ্যাঁ, আমরাও বলে যাই।

কিন্তু খোঁজটা কোথায় নেওয়া হবে, রাস্তার লোককে ডেকে কি আর কটেজের সন্ধান পাওয়া যায়!

গাড়ি নিয়ে এলোমেলো কিছু ঘুরে একে ওকে জিজ্ঞাসা করে কিছুই ফল পাওয়া গেল না। এখানে কোনো টুরিস্ট অফিসও পাওয়া গেল না।

—ম্যানেজারবাবুকে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু নির্দেশ পাঠাতে হবে, সময় করে উঠতে পারছি না, এদিকে এই সমস্যা, গাড়িটা একটু ওখানে রাখো ওই এস. টি.

ডি. বুথের কাছে। গাড়ি থেকে উনি নামলেন, আমিও নামলাম। দোকানের মালিকের সাদর অভ্যর্থনা দেখে বুঝলাম উনি এখান থেকেই নিয়মিত ফ্যাক্স করে থাকেন। আমার বাড়িতে টেলিফোন নেই, পাশের বাড়িতে আছে, মাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। কি আশ্চর্য দেখ! এখানে দেওয়ালে ঝোলানো অত বড়ো বোর্ড। গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়, বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়, ওয়েল ফার্নিসড্ কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়! একেই বলে কপাল! ভাবলাম আমি, পরক্ষণে ভাবলাম এখন আমি কপাল টপালও মানতে শুরু করেছি।

মন্দিরাকে দেখে মন একটু সুস্থির হওয়ার পর থেকে অন্য চিন্তাগুলি মনের মধ্যে ভিড় করতে শুরু করেছে—আমার টিউশনিগুলির কি হাল হবে? সংসারের কি অবস্থা? বাড়ির সবাই কি চিন্তা করছে?

কিন্তু এখন এখানে সবাই আমাকে কি এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে, নিজেকেও মনে হচ্ছে শক্তিধর, আমি এক বরাভয়দাতা! আর কি ভাবছি? ভাবছি যা থাকে কপালে!

উনি নিজেই টাইপ করছেন একমনে। আমি টেলিফোন তুলে নম্বর টিপলাম।

—হ্যাঁ, অনুপম বলছি..., মাকে বলে দিও আমি ভালো আছি... ইন্টারভিউ হয়ে গেছে। ... আবার ফোন করে জানাব। টেলিফোনের স্লিপ দেখে টাকা দিলাম।

একটু সময়—ওনার কাজ শেষ, টাকা দিলেন।

—বাড়িতে বুঝি বলে এসেছ ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ?

আমি কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম, তাড়াতাড়ি দেওয়ালের বোর্ডের দিকে ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। উনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন।

বাগানঘেরা সুন্দর কটেজ। দোকানের মালিক ভদ্রলোক দেখছি মন্দিরার চিকিৎসার জন্য আসা-ব্যাপারটা জানেন, মন্দিরার দ্রুত সুস্থতা কামনা করলেন।

ভাড়া শুনে আমার পিলে চমকে যাওয়ার অবস্থা, কিন্তু উনি নির্বিকার! টাকা থাকলে কতকিছু অনায়াসে পাওয়া যায়! —এত টাকা! —বললাম।

—আমাদের পার ডে যা হোটেল ভাড়া যায় তার তুলনায় অনেক কম, তার

সঙ্গে হসপিটালের কেবিন ভাড়া, তবে খরচের কথা ভাবি না আমি, আমার মেয়েকে সুস্থ করার জন্য যদি আমার সর্বস্বও খরচ হয়ে যায়—

আবহাওয়া কেমন ভারী হয়ে গেল, কিছুক্ষণ চুপচাপ, —তুমি আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকদিন থাক —অনুনয় ওনার কণ্ঠে—

অমন রাশভারি উঁচু মাপের মানুষ, কেমন এলোমেলো হয়ে পড়েছেন, —আপনার ওই ফ্যাক্স থেকে আমি কিন্তু এখানের হদিশ পেয়েছি— কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললাম।

—তাই তো! তুমি তো মস্ত গোয়েন্দা দেখছি!

—আপনি ফ্যাক্স করেন কেন? ফোনেই বলে দিলে হয়।

—এতসব information মুখে মুখে হয় না, বললে মনেও রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া একটা রেকর্ড থাকা দরকার, পরে ভুলে গিয়ে আমিও অস্বীকার করতে পারি—একাজটা কেন করেছেন, অত টাকা কেন তাকে পেমেন্ট করেছেন?

একটু চুপচাপ, কি যেন ভাবছেন— ভেবেছিলাম মেয়েকে বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট পড়াব— কি যে হয়ে গেল! কি যে হবে! ও কি আবার আগের মতো হতে পারবে?

—ভগবানের ওপর ভরসা রাখুন, —দৃঢ়স্বরে বললাম আমি, নাকি কে যেন আমাকে বলিয়ে নিল। নিজেকে কেমন শক্তিমান মনে হচ্ছে।

—তুমি আমাদের সঙ্গে থাক অনুপম!

কি করে কি করা হবে ভেবে উনি যেভাবে অস্থির হচ্ছিলেন সবকিছু কিন্তু বেশ সুষ্ঠুভাবে সহজেই হয়ে গেল। এ্যাম্বুলেন্সে স্ট্রেচারে করে হাসপাতাল থেকে মন্দিরাকে কটেজের বিছানায় তুলে দিয়ে গেল। কটেজের কেয়ারটেকার ঘরগুলি টিপ্‌টপ্ করে দিয়েছে, বিছানার চাদর থেকে শুরু করে বসার ঘরে সোফাটোফাতেও

পরিষ্কার আচ্ছাদন। একজন কাজের মহিলাও হাজির। আয়া আর ফিজিওথেরাপিস্ট হাসপাতাল থেকেই ঠিক করে দিয়েছে। বাজার দোকান করে নিয়ে এলেন কেয়ার টেকার রাজেশ। গ্যাসে চা তৈরি করে পরিবেশন করল কাজের মেয়ে উমা। আমরা মন্দিরার বিছানার সামনে বসে। পিছনে বালিশ দিয়ে মন্দিরা আধশোয়া।

—দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে—এ জায়গাটা কোথায় বাবা? আমি জানতাম কলকাতার হাসপাতালেই আছি।

—আমরা অনেক দূরে আছি মা। কলকাতায় অনেক অসুবিধা ছিল।

—ও! আমি কি আর ওই পাহাড়ে বেড়াতে যেতে পারব? হতাশ গলায় বলল মন্দিরা।

—আবার ওরকম কথা? নিশ্চয় পারবে, কত তাড়াতাড়ি সেরে উঠছ তুমি, কিন্তু ইচ্ছাশক্তিটা যদি না বাড়িয়ে তোলো তাহলে সব বৃথা হয়ে যাবে—কিভাবে 'স্যারের' গলা বেরিয়ে এল।

—আপনি তো ওইরকমই বলেন। চোখ বুজল মন্দিরা।

—অনেক ধকল গেল, তুমি একটু বিশ্রাম নাও, ঘুমোতে চেষ্টা কর, আমি উঠলাম।

বালিশ সরিয়ে ওকে শুইয়ে দিলেন মা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

—আবার আসবেন—মৃদুস্বরে বলল মন্দিরা।

আমরা বেরিয়ে এলাম ড্রইং রুম-এ।

—তুমি এখানে আমাদের সঙ্গেই থাক। যদিও দুটো মাত্র বেডরুম কিন্তু ড্রইংরুমেও একটা সিঙ্গল বেড রয়েছে।

—আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, চিন্তা করবেন না, কিন্তু আমি মন্দিরেই থাকতে চাই—দৃঢ়স্বরে বললাম আমি।

—বুঝতে পারছি, তুমি দেবতার দুয়ারেই থাকতে চাও—কেমন আত্মগত ভাবে বললেন উনি—তাই হোক, তাই হোক, আমরাও রোজ মন্দিরে যাব।

ক্রমশ আমি আরও গভীর ভালোবাসায় জড়িয়ে যাচ্ছি, যদিও জানি মন্দিরা আমাকে শুধুমাত্র সহানুভূতিশীল শিক্ষক ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।

মন্দিরার বাবা মা অবশ্য বুঝতে পারে মন্দিরার প্রতি গভীর ভালোবাসাই আমাকে টেনে এনেছে এতদূরে, আর সে ভালোবাসা প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও এটা মেনে নেওয়া যায় না, তবু এই মুহূর্তে মেয়ের সুস্থ হয়ে ওঠাটাই যেহেতু ওনাদের কাছে প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য, তাই আমার সহযোগিতাই ওনাদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সারাক্ষণ আমি তাই যেমন ঈশ্বরের কাছে মন্দিরার সুস্থতার কামনা করি তেমনই প্রার্থনা করি ঠিক সময়ে আমি যেন নিজেকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারি। মনোবেদনা থাকবেই, কিন্তু শক্তিও যেন থাকে। নিজেকে অনুকম্পার পাত্র না করে তুলি।

পরদিন পূজা প্রার্থনার পর সাধুজি জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েকে রোজ কুণ্ডস্নানের কিছু ব্যবস্থা হল কিনা?

কিভাবে এটা করা সম্ভব? গাড়ি করে ওকে আনা যায়, কিন্তু বাড়ি থেকে গাড়িতে তোলা, আবার এখানে এনে কুণ্ডে নিয়ে যাওয়া, আবার স্নানের পর ফেরত নিয়ে যাওয়া—কোলে করে করা যায়?

—ওর বাবার পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়, ঘাড়ে বা কোমরে ব্যথা লেগে যেতে পারে। আর মেয়ে যদি পড়ে গিয়ে চোট পায় তাহলে যে কি হবে—শিউরে উঠলেন মা।

তার চেয়ে ফিজিওথেরাপিই চলুক, ডাক্তারবাবু বলেছেন এতেই হবে, তবে সময় লাগবে।

সাধুজির মনে কি আছে কে জানে! বললেন—ক্যারে বেটা, তু জওয়ান আদমি, করনে নেহি সকেগা?

—আমি!—চমকে উঠলাম।

নীচে যেখানে গাড়ি আসে ওখান থেকে সোজাসুজি কুণ্ডে চলে যাওয়ার রাস্তা আছে, মন্দিরে উঠে আবার নামতে হবে না। দূর দূর গ্রাম থেকে কখনো কখনো গ্রাম্য মানুষেরা এরকম ধরনের রোগীকে নিয়ে আসে, এখানে থাকে, রোজ স্নান করায়—সাধুজি জানালেন এবং দ্রুত সেরেও যায়, কিন্তু এটা নিয়ে প্রচার উনি চান না তাহলে হয়ত এমন ভিড় হবে মন্দিরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে, তাই যারা আসে তাদের উনি প্রচার করতে বারণ করেন। ঈশ্বর যাকে টেনে আনবে শুধু সেই আসুক।

তুমি যদি পারো খুবই ভালো হয়। আমরা পাশে পাশে থাকব, আয়াকেও সঙ্গে রাখা হবে, স্নানের পর—সঙ্কোচে চুপ করে গেলেন মা।

আমি নত মুখ, কোনোক্রমে বললাম—পারব।

জীবনে প্রথম ভরা যৌবনা নারীস্পর্শ! যদিও অসুস্থতায় কিছু শীর্ণ তবু ভরা যৌবনা আমার দু বাহুর আশ্রয়ে ... সেই নারী যাকে আমি ভালোবাসি, ... কিন্তু না, আমার শরীরের মধ্যে ছলকে ওঠে না যেন রক্তের ঢেউ ... এ তো এক প্রায় অসাড় শরীর আমি বহন করছি ... আমার স্পর্শ কোনো উত্তাপ ছড়াবে না ওই শরীরে ... মমতা, পরম মমতা জাগছে আমার মনে ... ঝলমলি! আমার ঝলমলি! মনে মনে বললাম আমি—মনে হচ্ছে তোমার কপালে পরম মমতায় এঁকে দিই চুম্বন ... আমি মনে মনে মন্দিরার কপালে চুম্বন দিলাম।

বাড়ি থেকে গাড়িতে তুলেছি। মন্দিরাকে নিশ্চয় বলে রেখেছিল ওরা, ও কোনো প্রশ্ন করল না। মারুতি ভ্যানের বড়ো দরজা দিয়ে ওকে শুইয়ে দিয়েছি আসনে, ওর মা ওর মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসল, সামনের আসনে ওর বাবা ও আয়া, আমি ড্রাইভারের পাশে। আর এখন এই বৃক্ষনিবিড় পাহাড়ি পথে চলতে চলতে কি উচ্ছ্বাস! কি আবেগ! কি বিহ্বলতা! এত মাধুরিমা আছে জীবনে!

বালিকা কৌতূহল ভরা দৃষ্টি ওর, অবাক হয়ে দেখছে আকাশ। চুল অনেকটা কেটে দেওয়া হয়েছে তাই আরও বালিকার মতো লাগছে। পরনে গোলাপী রঙের ম্যাক্সি, গায়ে জড়ানো হালকা উলের চাদর লাল রঙের। এখন দুপুর, রোদ্দুরে তাপ।

প্রথম যেদিন এখানে পৌঁছেছিলাম বেশ শীত লাগছিল, এখন অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে, এটুকু পথ অতিক্রম করার পরিশ্রমে বেশ গরম লাগছে। সাবধানে ওকে কুণ্ডের পাশে পা ঝুলিয়ে বসিয়ে দিলাম, পা দুটি উষ্ণ জলে ডুবে গেল।

ওর মা আর আয়া ওকে ধরে রাখলে আমি জলে নামলাম, মা ওর গা থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন, আমি অতি সন্তর্পণে দুর্লভ অমূল্য রত্নকে তুলে নিয়ে জলে রাখলাম—ধীরে অতি ধীরে উষ্ণ জলকে ওর শরীর ঢেকে দিতে দিলাম। গভীরতা হাঁটু পরিমাণ, পা ছড়িয়ে বসা ওর শরীর, জলের ওপর ভেসে আছে কমলমুখমণ্ডল, পিঠে ঘাড়ে হাত দিয়ে ধরে রেখেছি, পা ডুবিয়ে বসেছি কুণ্ডের পাড়ে।

“ .... বহমান উষ্ণ জলধারা ... বহমান উষ্ণ জীবন ... উষ্ণ কিরণে সূর্য ... জীবনের উৎস দেবতা ... ওই মন্দির চূড়ায় উড়ছে পতাকা ... পরমেশ্বর বিরাজ করছেন সর্বচরাচরে ... কী এক গভীর অনুভবে আমি শিহরিত হলাম!

জলের উষ্ণতা যখন আমার শরীরে অসহ লাগবে তখনই ওকে তুলে নিতে হবে বলেছেন সাধুজি।

তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলাম পাড়ে, মা আর আয়া দুপাশ থেকে ধরে নিলেন। পোষাক বদল হয়ে গেলে আমাকে ডাকতে বললাম।

মন্দিরে উঠে এলাম। একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে বসে মন্দিরার বাবা, আমাকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকলেন, আমি পাশে বসলাম।

—জীবনে কখনো আমি এভাবে চুপচাপ বসে সময় কাটাইনি—বললেন উনি—এই যে এখানে আসি, বসি, মনের মধ্যে কেমন শান্তি বিরাজ করে, এটা আমার জীবনে একটা আবিষ্কার ; মনে হচ্ছে প্রতিদিন ব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় রাখা ভালো নিজেকে নিয়ে নীরবে বসার জন্য।

আমি কি বলব! উনি নিজের অনুভবের কথা নিজেকেই বলছেন। নিঃশব্দে বহে যায় সময় ... নীচের থেকে ডাক শুনতে পাচ্ছি, আমি উঠলাম।

ঘুম ... ঘুম ... ঘুম... শান্তির ঘুম ... সুখের ঘুম ! ... সারা রাত ... এমন শান্তির ঘুম কতদিন আসেনি জীবনে। কেটে যায় সারা রাত। ব্রাহ্ম মুহূর্তে সাধুজী মন্দিরে মঙ্গল আরতি করেন, কিশোর ঘন্টা বাজায়, তখন ঘুম ভেঙে যায়। তখনো অন্ধকার, কিন্তু আমি উঠে পড়ি। আসলে শোয়াও তাড়াতাড়ি, ওঠাও তাড়াতাড়ি তাই। তখন পাখিরাও উঠে পড়ে, গান গায়।

সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি। আমার একান্ত প্রিয় মাউথ অর্গান সঙ্গে নিয়ে গাছপালায় নিবিড় ভগ্ন দুর্গপ্রাসাদে ঘুরে বেড়াই। সূর্যকিরণ গাছেদের ফাঁক দিয়ে ঝিলিমিল। আমি মাউথ অর্গানে সুর তুলি---বিলম্বিত লয়ে। শ্রোতা গাছেরা, পাখিরা, আর জংলি আগাছার ফুলেরা। ক্রমশ বুকের মধ্যে জেগে ওঠে প্রতীক্ষার ঢেউ। সেই ঢেউগুলি ক্রমশ উত্তাল হয়ে ওঠে ... তারপর একসময় গাড়ির হর্ন—গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় থামলে আমি নেমে আসি—আমার একান্ত মিতাকে আনতে যাই, তুলে নিই দুবাহুর আশ্রয়ে।

—মনের জোরটা বাড়াও, তবে তো শরীরের জোর বাড়বে,—বলি আমি।

—তাহলে ? অন্যমনস্কভাবে আকাশ দেখতে দেখতে বলে মন্দিরা।

—তাহলে আবার কি ? তাহলে হাঁটবে ছুটবে,—

—রোজ রোজ ওই একই কথা—বাধা দিয়ে বলে মন্দিরা—আর কোনো কথা নেই ?

—আর-আ-র কি-ক-থা ?

—নেই বুঝি ? তবে থাক। শুধুই মাস্টারি !

কত কথা আছে ... বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে ... সে কথা থমকে আছে, বলা হয় না যে ...

... ঝলমলি, ও ঝলমলি—

উঁ?

আমার দিকে দেখ একটু!

আমি তো এখন আকাশ দেখছি।

তবে কি আমি শুধু একাই দেখব?

তারপর আমি দেখব—

দেখবে না তো?

না—

তাহলে দেব ফেলে!

ইস্!

পারি না বুঝি?

আহারে!

এই দিলাম ফেলে

কেউ যদি এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা এনে বলে—এই নাও, কিন্তু এক্ষুনি ঝলমলিকে ফেলে দিতে হবে—তাহলেও পারবে না! বলতে বলতে ঝলমলির নিবিড় চাহনি...

ঝলমলি!

উঁ!

কিন্তু যদি এমন হয়—দেবতা এসে বললেন—এখনই তোমার প্রাণ নেব, ওকে ফেলে দাও!'

ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই। দেবতা অমন অন্যায় কথা বলবেনই বা কেন?

ঝলমলি! ঝলমলি! ঝলমলি! (একটা চুমু কপালে, একটা একটা চুমু দুচোখে. একটা একটা চুমু দুগালে, একটা চুমু ঠোঁটে—) ঝলমলি! ঝ-ল-ম-লি—

উঁ হুঁ! নড়বড়ি ঝড়ঝড়ি ঝড়ঝড়ি!

কি! এ আবার কি কথা!

তাইতো! আমিতো সত্যি সত্যি নড়বড়ি ঝড়ঝড়ি হয়ে গেছি।

তাহলে সত্যি ফেলে দেবো—

বললাম তো! এই নাও এককোটি স্বর্ণমুদ্রা—দাও ফেলে ... মনে মনে এতসব

বলতে বলতে নীরবে পেরিয়ে এলাম রাস্তাটকু, মন্দিরা চোখ বুজিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণায় লেগে আছে মধুর একটু হাসি।

—মন্দিরা!—আস্তে ডাকলাম, মন্দিরা চোখ মেলল, আমি আমার শরীর মন মথিত করে তুলে আনলাম ভালোবাসা, ছড়িয়ে দিলাম আমার দুচোখে। উষ্ণ প্রস্রবণ আমাদের ডাকছে।

—তুমি যে রোজ রোজ এই দুপুরবেলা শুধু মুখে ফিরে যাও আমার মোটেই ভালো লাগে না—বললেন মন্দিরার মা।

প্রত্যেক দিনের মতো আজও মন্দিরাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে—আসি—বলে বেরিয়ে যাচ্ছি—উনি সামনে এসে বললেন।

প্রথম দিনই উনি বলেছিলেন—দুপুরের খাওয়া রোজ এখানে খেয়ে যেতে, আমি রাজি হইনি। বলেছিলাম আপনাদেরই খাচ্ছি তো, অতসব জিনিসপত্র কিনে দিয়ে এসেছেন, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আজ বললাম, যেদিন মন্দিরা খাওয়ার টেবিলে বসে খেতে পারবে সেদিন আমরা সকলে একসঙ্গে বসে খাব।

—প্রতিজ্ঞা! মৃদু গলায় বললেন উনি—বেশ তাই হবে।

বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে উঠলাম। রোজ গাড়ি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে আসে।

কি করে বোঝাই প্রতিজ্ঞা টতিজ্ঞা কিছু নয়, এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে চাই না। ধীরে ধীরে মন্দিরা সতেজ হয়ে উঠছে, যদিও হাত পা সচল হয়নি কিন্তু ওর চেহারায়, ওর দৃষ্টিতে, হাসিতে কথাবার্তায় সজীবতা উছলে পড়ছে। ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে আমারও সুখের দিন। একটু হাঁটাচলা—ব্যস তারপরই একদিন টুক করে সরে পড়তে হবে। ঘরের ছেলে হয়ে গিয়ে লাভ নেই। আজ ওনারা এই দূর দেশে মন্দিরার এই অবস্থায় আমার ওপর যতটা নির্ভরশীল কলকাতায় ফিরে বেড়ে যাবে ঠিক ততখানি দূরত্ব। তখন উনিই হয়ত মেকি গলায় বলবেন, অনুপম মন্দিরার

দাদার মতো! কি ভালোই না বাসে! তা ছাড়া মন্দিরা আমার প্রেমে পড়বার, আমাকে ওভাবে ভালোবাসবার কোনো কারণই নেই। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে পারে, তার বেশি আর কি আমি আশা করতে পারি! কি দেখে আমার প্রেমে পড়বে মন্দিরা!

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে হবে। আমার ট্যুইশনিগুলোর কি অবস্থা! ওগুলোই আমার সম্বল। অহেতুক রোমান্টিক হয়ে লাভ নেই। আজ মন্দিরাকে স্নানে নিয়ে যাবার সময় আমি বড়ো ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। কি একটা সামান্য কথা বলেছে ও—আর কোনো কথা নেই! এইতো! এর মানে কি এত অর্থবহ যে ও আমার মুখে প্রেমালাম—একটা ঝাঁকুনি—

মন্দিরের রাস্তায় গড়িয়ে নামছে গাড়ি, ব্রেক কষেছে ড্রাইভার। আমি আমার পঁচিশ বছর বয়সের জীবনে এরকম গাড়িতে উঠিনি। এসব অলীক স্বপ্নের দিন, নামো অনুপম, এতসব স্বপ্নের গাড়ি থেকে নামো, খালের ওপর ওই বাঁশের সেতু, ওর ওপর সাইকেলও পেরোয় না।

... বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে চলে যাবে ঘরে, পিছনে পড়ে থাকবে বিলাসিত আকাশ কুসুম...।

—স্যার মশাই!

এ আবার কেমনতর ডাক! আমি চমকে উঠলাম! কেমন মিষ্টি মিষ্টি, আর রহস্যজনক!

মন্দিরাকে স্নান করাতে আনার প্রথম দু-তিনদিন ওনারা তটস্থ ছিলেন। ওর মা, আয়া মাথার দিকে পায়ের দিকে পাশে পাশে মনোনিবেশ সহকারে হাঁটতেন, ওর বাবা ঠিক পিছনে। কিন্তু যখন বুঝলেন আমি স্বাভাবিকভাবেই ওকে বহন করে নিয়ে যেতে পারছি তখন থেকে ক্রমশ স্বচ্ছন্দ। কথা বলতে বলতে পিছনে আসেন

এই পর্যন্ত। আজ মন্দিরা ডেকে উঠল—স্যার মশাই! আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ওর চোখ দুটি হাসি হাসি ঠোঁটের কোণায়ও চাপা হাসি।

—আজ একটা দারুণ ভালো খবর আছে! আজ সকাল থেকে আমি হাতের আঙুলগুলো ভালোই নাড়াতে পারছি।

—তাই নাকি?

—তাইতো! দেখবেন?—বলতে বলতে মন্দিরা বাঁহাত ধীরে সরিয়ে আনল আমার বুকে কাছে, জামার বোতাম ধরে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিল। বুকের মধ্যে আমার শিহরণ, এ কি মন্দিরার সুস্থতার খবরে, নাকি অঙ্গুলি স্পর্শে! তাওতো জামার ওপর এবং বোতামে!

—এ তো সত্যিই দারুণ খবর!

—আঙুলে একটু জোরও এসেছে।

—তাই নাকি?

—দেখবেন?

—কেমন করে?

আমার বুকের ওপর হৃৎপিণ্ডের কাছে চিমটি কাটল মন্দিরা—লাগছে?

—না তো!

—মিথ্যে কথা—আরও জোর চিমটি।

—উঃ! উঃ!

—আরও জোরে দেব?

—পারবেই না!

—সত্যি পারব, কিন্তু দেব না, লাগবে।

অতঃপর স্নান শেষে তুলবার সময় বললাম—দেখ তো, দাঁড়াতে পার কিনা।

—পারব?

—চেষ্টা কর, আমি ধরে আছি তো, ভয় কি।

আমাকে আঁকড়ে আস্তে আস্তে দাঁড়াল মন্দিরা। উত্তেজনায় কাঁপছে—মা, মা, দেখ আমি দাঁড়িয়েছি, মা আমি দাঁড়িয়েছি, দাঁড়িয়েছি—কান্নায় হাসিতে মাখামাখি

হয়ে আমার বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে বলতে লাগল মন্দিরা। ওর মা এগিয়ে এসেছেন, অত জোরে ডাক শুনে ত্রস্তে মন্দির থেকে নেমে এসেছেন ওর বাবা—কি হয়েছে, কি হয়েছে?

—আমি দাঁড়িয়েছি বাবা, আমি দাঁড়িয়েছি, দেখ, দেখ—বলতে বলতে পা কাঁপছে ওর, আমি রোজের মতো ধরে তুলে বসালাম, রোজের মতো ওরা ধরে নিলেন।

ফেরার সময় আর কিন্তু ও দাঁড়াতে চাইল না, বলল বাড়ি ফিরে খাট ধরে ধরে চেষ্টা করবে। অতএব কোলে উঠে দিব্যি হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে—মানে আমার জামার বোতাম নিয়ে খেলতে খেলতে গাড়িতে উঠল।

আমি যে একটা রক্তমাংসের মানুষ, আমার মন আমার শরীর—এসব নিয়ে কিচ্ছু ভাবনা নেই এই মেয়ের। কিন্তু আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি!

কটেজে ফিরে ওর ঘরে খাট ধরে দাঁড়াল, যদিও দুপাশে বাবা মা দুজনেই ধরে রেখেছে।

—হাত ওপরে তোল দেখি—বললাম আমি।

হাত ওপরে তুলল ও, দুই গালে হাত রেখেছে, বলল—কান ধরব স্যার? হাসছে হি হি করে, কি দুষ্টু!

সবাই হাসছে! হাসির হাট বসেছে বুঝি! এত আনন্দ হাসির মেলা জীবনে দেখিনি, অংশীদার হইনি।

—আজ আর বিছানায় বসে নয়, খাওয়ার টেবিলে বসে খাবে তুমি—বললাম আমি, আজ আমরা একসঙ্গে খাব।

আনন্দ আজ কানায় কানায় ভরে উঠুক।

কিছুটা নিজ হাতে খেল মন্দিরা, কিছুটা খাইয়ে দিলেন ওর মা।

দুদিন কিছুটা হেঁটে কিছুটা কোলে কুণ্ডের কাছে গেল মন্দিরা, তারপর দুদিন পুরোপুরি হেঁটে যেতে পারল। অবশ্য পাশে পাশে মায়ের বাহু ধরে। পরের দিন স্নান শেষে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল মন্দিরে—আমরা সবাই পাশে পাশে, গর্ভগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তারপর লুটিয়ে প্রণাম। কতক্ষণ পর উঠে বসে চোখ মুছল। আমরা কেউ কোনো কথা বলতে পারছিলাম না।

—রোজ সকালে আমি নটরাজকে প্রণাম করে নাচ শুরু করি—আত্মগতভাবে বলল মন্দিরা—কতদিন পর আবার!

সাধুজি ওর মাথায় ফুল ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন।

সৌজন্যবোধে গাড়ি পর্যন্ত ওদের সঙ্গে হেঁটে গেলাম আমি। সকলে উঠল, মন্দিরা বসল বাবা মায়ের মাঝখানে। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। হাসিমুখে হাত নাড়ল মন্দিরা, ওর বাবা মাও, কিন্তু কেউ আমাকে সঙ্গে যেতে বলল না। মনটা ক্রমশ ভারাক্রান্ত। যদিও মনকে বোঝাতে চাইলাম—কেনই বা বলবে! কিন্তু মন মানে না। মন বলছে এই তো হল শুরু। এবার নিজেই নিজেকে সরিয়ে নাও। ফিরে যাবার বেলা এল, পারলে আগামী কালই চুপচাপ বেরিয়ে পড়। কিন্তু না, কাল বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করেছেন ওঁরা, একটু আগে সাধুজির সঙ্গে অত কথা হল, সাধুজি সানন্দে রাজি হলেন, আমাকে বললেন, ফুলে ফুলে সাজাতে হবে মন্দির—ঠিক আছে কালকের উৎসব শেষ হোক, কিন্তু তারপরই প্রস্থান এবং সেটা কাউকে না জানিয়ে।

অনেক তাড়াতাড়িই চলে এলেন ওরা। কত জিনিসপত্র, আর ফুল। সকলে মিলে বয়ে নিয়ে এলাম। মন্দিরা ধীরে ধীরে হাঁটছে। ওর হাতে কয়েকটা প্যাকেট— জামাকাপড়ের প্যাকেট যেন।

—এই যে স্যার মশাই, এটা ধরুন—এই হলুদ রঙের প্যাকেটটা, এটা আপনার।

—কি আছে এতে?—আমি হাতে নিয়ে দেখতে চাইলাম।

—স্নান করে পরবেন।

—এ কি, এ যে ভীষণ দামি—একে কি বলে যেন?

—একে বলে শেরওয়ানী। নিজে পছন্দ করে কিনেছে মা।

—কিন্তু—

—ওসব কিন্তু টিন্তু নয় স্যার মশাই, বাবা বলেছে সবাই নতুন কাপড় জামা পরে পূজায় বসবে।

তা সেই নতুন কাপড় জামা স্নান করে পরে এলো মন্দিরা, দাঁড়াল মন্দির চত্বরে। কি সুন্দর! জরির কাজ করা ওই জামা কোমর ছাপিয়ে আর নামেনি, তারপর কোমর থেকে মাটি ছুঁয়ে লুটোপুটি নেমেছে ওটা কি ঘাগরা? কতদিন লেগেছে কারিগরের? জরির ওই কাজ করতে? ওই দুল, ওই হার, কপালের টিপটি পর্যন্ত বুঝি পোষাকের সঙ্গে মানানসই করে গড়া। আর দুহাতে অত্তো চুড়ি! চারিদিকে কারুকার্যময় স্তম্ভ সারির মাঝে অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত এক রূপবতী! ... এই সেদিনও আমার দুবাহুর আশ্রয়ে তুলে নিয়েছি ওই মেয়েকে! ভাবা যায় না, আর ভাবা যায় না! ও অনেক অ-নে-ক দূরের রাজকন্যা ... ওকে দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে উথলে ওঠা মুগ্ধতার সুখ ছাপিয়ে বেড়ে ওঠে দুঃখ। হায় অনুপম! হায়! একি হল! কি করে কাটাবে সমস্ত জীবন! না কি জীবনের দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত করে নেবে?

—স্যার মশাই—খুব মৃদুস্বরে ডাকল মন্দিরা—আমার চমক ভাঙল, সাড়া দিলাম—উঁ?

—পোষাকটা বুঝি ভালো দেখাচ্ছে না?

—কি বলছ কি? এত সুন্দর! বলবার ভাষা নেই!

স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল মন্দিরা, বাব্বাঃ, মুখটা এমন হয়ে গেল, আপনার! ভয় পেয়ে গেছিলাম। কিন্তু বাবা বলছিল আপনার জামাটা আরও সুন্দর।

—তাই?

—হ্যাঁ স্যারমশাই, তবে আমার তাতে হিংসা নেই, আপনি আমার—

সহসা কথা ঘুরিয়ে নিল মন্দিরা—যান তাড়াতাড়ি স্নান করে জামা কাপড় পরে আসুন, আমরা দুজনে ফুল দিয়ে মন্দির সাজাব।

পোষাক পরে এমন লজ্জা করছে! আড়ষ্ঠতা কাটিয়ে ঘর থেকে বেরোতে পারছি না। অথচ মন্দিরা ডেকেই চলেছে। মন্দিরে দাঁড়িয়ে ও যে অত জোরে জোরে স্যারমশাই বলে ডেকে চলেছে ওর বাবা মা শুনছে এটা ভাবছে না?

স্যার কথাটার সঙ্গে মশাই কথাটা জুড়ে ও কেমন তরল করে নিয়েছে সম্বোধন। কি যে আছে ওর মনে! দুঃখের কপাল আমার, কাঁদতে হবে সারাজীবন।

—সত্যিই আপনারটা অনেক বেশি সুন্দর—পাশে দাঁড়িয়ে গায়ে গা ছুঁইয়ে তুলনা করল।

—মোটেই না, বললাম আমি—তুমি কত সুন্দর, আবার তার সঙ্গে ওই সুন্দর পোষাক—সব মিলিয়ে কি ঝলমল! তুমি সত্যিই আবার ঝলমলি হয়ে উঠেছ।

—ঝলমলি!—মানে?

—ওই-ও-ই নামে আমি মনে মনে তোমাকে ডাকি—কেমন থতমত খেয়ে বলে ফেললাম আমি।

—হিঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ! ঝলমলি! বাজে নাম, বিচ্ছিরি নাম—বলতে বলতে ছুটে পালাল, দাঁড়াল গিয়ে স্তূপীকৃত ফুলমালাগুলির কাছে, তুলে নিল একটা মালা সযত্নে, তারপর আমার দিকে ফিরে ডাকল—আসুন—

একটা ছোটো টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি স্তম্ভে মালা জড়িয়ে দিই, মাঝে তার

ফুলের স্তবক বাঁধি। মালাগুলি ফুলগুলি হাতে হাতে তুলে দেয় মন্দিরা, মুখ একটু তুলে তাকায়, আমি একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেখি আর একটি প্রস্ফুটিত ঢলঢল ফুল—সজীব, সতেজ! মাঝে মাঝে অকারণে হেসে ওঠে ফুলটি, ঠোঁট হাসে, চোখ হাসে, উছলে পড়ে আনন্দ!

ওর মা ব্যস্ত পূজার জোগাড়ে। উনি পরেছেন গরদ রঙের দক্ষিণ ভারতীয় শিল্কের শাড়ি, কারুকার্য করা মেরুন রঙের পাড় আর আঁচল। সুখী সুখী মুখে কি অপরূপ দেখাচ্ছে ওনাকে। সত্যি, সুখী সধবা বাঙালি মহিলাদের চেহারায় আলাদা একটা উজ্জ্বলতা আছে। ওই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে, মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে। আমার মায়ের মুখ মনে পড়ল, বুকের মধ্যে কেমন এক দুঃখের মোচড়। আমার মাও দেখতে সুন্দর কিন্তু সাদা কাপড়ে দুঃখী মুখে কি ম্রিয়মান।

সাধুজি ওদিকে রান্নাঘরে ভোগ বাঁধছেন। আজ বিশেষ ভোগ! বড়ো সুগন্ধ ছড়িয়েছে।

কিশোরের জন্য এসেছে ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি, সে মায়ের কাজে সাহায্য করছে। সর্বোপরি পরিবারের কর্তামশাই আজ সত্যি কর্তাবাবুর মতো ধুতি আর লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি পরে সোনা রঙ ফ্রেমের চশমা পরে সব পর্যবেক্ষণ করছেন। ওনাকেও খুব সুখী সুখী লাগছে।

সবাই সুখী, আমিও। এমন সুখের দিন জীবনে কখনো আসেনি। তবু কেন দুঃখ ঠেলে উঠতে চায়? কিছুতেই যে মেলানো যায় না এই সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক! অঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানে কোথায় আছে একটা ভুল, যে ধাপটা কিছুতেই অতিক্রম করে ওঠা যায় না।

—কি হল? এই যে মশাই, কি হল?—মৃদু ঠেলা দিয়ে বলে মন্দিরা—হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গেলেন কেন?

—হ্যাঁ, দাও—আমি হাত বাড়িয়ে ফুলমালা হাতে নিই।

—মাঝে মাঝে কি যে হচ্ছে আপনার! পারি না বাবা!

পূজা হয়। আরতি হয়। পুষ্পাঞ্জলি হয়। তারপর ভোগ নিবেদন করে কিছুক্ষণের জন্য গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ করেন সাধুজি, পাখোয়াজ, নিয়ে এসে বসেন, কিশোর হাতে তুলে নেয় ঘন্টার দড়ি, আমরা বসেছি একধারে। মন্দিরার বাবা মা জানেন, কিন্তু ওর জানা নেই সাধুজির বন্দনা গানের কথা, তাই অবাক হয়ে তাকায়, ইশারায় জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার?

আমি উত্তর দেবার আগেই গুরু গুরু বেজে ওঠে পাখোয়াজ, তালে তালে ঘন্টা ধ্বনি, আমি পকেট থেকে বার করি বাঁশি। শুরু হয় গান। সংস্কৃত এ গান—গান নয়, সঙ্গীত! মন্দ্রিত মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দিরগৃহ। মন্দিরগৃহের মধ্যে গম্বুজ প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে সুর আরও মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আমি সাবধানে বাঁশিতে সুর লাগিয়ে অনুসরণ করি কণ্ঠ। নীচু পর্দার পংক্তিতে কিশোরও আজ গেয়ে উঠছে, এ যে কি স্বর্গীয় মাধুরিমায় ভরে উঠল চরাচর!... প্রথম আদী শিবশক্তি ...

বিস্ময়ে অপলক মন্দিরার দৃষ্টি, ওর মুখে খেলা করছে কি এক আনন্দ অনুভব। সুর মূর্চ্ছনা ওর মনে—মন থেকে শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে আনন্দ অনুভব—বুঝতে পারছি। ও কারো দিকে তাকাচ্ছে-না, কেমন আত্মমগ্ন।

ধীরে উঠে দাঁড়াল মন্দিরা, কেমন ঘোরের মধ্যে আছে যেন, লীলায়িত ভঙ্গি তে এগিয়ে গেল মেঝের কেন্দ্রস্থলে, নিবেদিত প্রাণ শরীর দুলে উঠল বিলম্বিত লয়ে। এ কি প্রার্থনা! এ কি আরতি! এ কি আত্মনিবেদন!

সঙ্গীতের বেড়ে ওঠে লয়, তালে তালে দ্রুত হয় নৃত্য। সত্যই গুণবতী তুমি মন্দিরা! তুমি দেবতার বিশেষ সৃষ্টি! নিজেকে মনে হচ্ছে ভিক্ষুক, বসে আছি তোমার চরণতলে। সত্যি আমি তোমার যোগ্য নই।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে ভয়ের কম্পন, সঙ্গীত অতি দ্রুতলয়ে। নৃত্যছন্দে চঞ্চল পদযুগল সেই লয়ে তাল মিলিয়ে চলেছে। সাধুজি গাইছেন চোখ বুজে, আমি আকুল চোখে তাকালাম ওর বাবা মায়ের দিকে— ওঁদের চোখেও ভীতি— কিছু একটা দুর্ঘটনার ভয়ে কাঁটা আমরা। কিন্তু কিছু করা যাচ্ছে না, মনে হয় বাধা দিতে গেলে বা কিছু বলতে গেলেও ভঙ্গ হবে একাগ্রতা, ছিটকে পড়েই যাবে হয়ত।

তেহাই দিয়ে শেষ হয় সঙ্গীত, সেই তালে তাল দিয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়ে মন্দিরা, স্থির শরীর। আমরা ছুটে যাই, সাধুজি ছুটে আসেন—কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে মন্দিরার দেহবল্লরী।

—মা—সাধুজি ডাকেন। মা পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। মন্দিরা আরও কাঁদে, গুন গুন করে শুধু বলে আমি পেরেছি, আমি পেরেছি, আমি পেরেছি।

সাধুজি ওঠেন, খুলে দেন গর্ভগৃহের দ্বার।

মন্দিরা ধীরে ধীরে উঠে বসে, আমরা ওর চারপাশে ঘিরে, কি জানি কি ভেবে ও আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে দুহাত— আমি ধরে নিই, ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ও, পা কাঁপছে।

—শান্ত হও, শান্ত হও—মৃদু স্বরে বলি আমি।

মা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন ওর ঘর্মাক্ত অশ্রুসিক্ত মুখ।

বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে দেন গভীর স্নেহে।

—তুমি শুদ্ধ হয়ে উঠলে মন্দিরা—গাঢ়স্বরে বলি আমি—না, কে যেন বলায়—সেদিনের সেই গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল, তুমি শুচি হয়ে গেলে।

সকলে একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। সাধুজি পরিবেশন করলেন। বড়ো খারাপ লাগছে—সাধু মানুষ, নিজে না খেয়ে আমাদের সেবা করছেন। কিন্তু এটাই রীতি, সকলকে খাইয়ে তবে উনি খাবেন।

—চারপাশটা একটু ঘুরে দেখব বাবা?

—দেখবে? দেখ। তবে সাবধানে হাঁটাচলা কোরো।

খাওয়া দাওয়ার পর সাধুজি এসে বসেছেন, আমরা সবাই এলোমেলো বসে। মন্দিরার বাবা দু একটি কথা জিজ্ঞাসা করছেন সাধুজিকে— যেমন—মন্দির কত প্রাচীন, কাদের তৈরি, এমনই সাধুজি এখানে আছেন নাকি কেউ ভার দিয়েছেন, খরচ চলে কিভাবে?—সাধুজি জানালেন মন্দির আর ওই দুর্গ খুব প্রাচীন। কোনো মহারাজার প্রতিষ্ঠিত, তবে বর্তমানে আধাসরকারি এক ট্রাস্টী বোর্ড এর অধীন, এঁদের অফিস ও আশ্রম আছে হরিদ্বারে; বেশ বড়োই আশ্রম, সেখান থেকেই সাধুজি এ মন্দির দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়েছেন, সেখান থেকে কিছু সাহায্য আসে, আর মাঝে মধ্যে কিছু দর্শক পুণ্যার্থী আসেন, কতটুকুই বা দরকার তাঁর!

এসব কথাবার্তার মাঝে মন্দিরার উসখুস, একসময় বলল চারপাশটা একটু ঘুরে দেখব বাবা?

—শরীরে অনেক ধকল গেল, খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করাই ভালো—বললাম আমি।

—ইস্! সব সময় মাস্টারি। আমার এখন একটু ঘুরতে ইচ্ছে করছে, চলুন—মা হাসছেন, বাবা হাসছেন, সাধুজি হাসছেন।

আমরা মন্দির চত্বর থেকে নেমে এলাম।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে একসময় আমার ঘরের সামনে। দরজা খোলাই আছে, উঁকি দিল মন্দিরা।

—এখানে আমি থাকি।

—তাই বুঝি! ঢুকে পড়ল—বাঃ! বেশ ঘরতো—তক্তাপোষে বসতে বসতে বলল, তারপর শুয়েই পড়ল,—আহ্! কি আরাম!

আমি দাঁড়িয়েই আছি, হতভম্ব।

—বসুন, একটু সরে গিয়ে বলল, আমি বসলাম।

—খুবই পরিশ্রম করেছ আজ, কি অসাধারণ নাচ— কেমন ঘোরের মধ্যে ছিলে, সম্মোহিত যেন।

—কিছু সুর মনের মধ্যে এমন নাড়া দেয়—কেমন যেন হয়ে যাই, উনি অপূর্ব গান করেন।

—তুমি সত্যিই গুণবতী মন্দিরা, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে তোমার ওপর।

—ছাই, আমি একটা মাথামোটা বোকা মেয়ে।

—ওটা তোমার বিনয়, তুমি ঠিকই জানো তোমার দক্ষতা।

—বললে হবে? আমার একটুও বুদ্ধি নেই, একটাও অঙ্ক কষতে পারি না। বাবা বলে অঙ্কে যাদের মাথা ভালো তারাই আসল বুদ্ধিমান, যেমন আপনি।

—বলেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ, যেদিন আমি টেস্টে অ্যালাও হলাম সেদিন বলছিলেন।

—ও তো কাজের বুদ্ধি মন্দিরা, তুমি হচ্ছ প্রতিভাময়ী শিল্পী, প্রতিভা ঈশ্বরের দান, সবাই পায় না মন্দিরা।

—ইস্, কি সব বড়ো বড়ো কথা, স্যার মশায়ের—আমার মুখের সামনে অপূর্ব নৃত্যমুদ্রায় হাত নাড়িয়ে দিল মন্দিরা, বলল, আমার সেই নামটা কি হল? ওই যে ঝড়ঝড়ি—

—এই, এই, আমি তাই বলেছি, ওরকম বাজে করে? খুব বকব দুষ্টু মেয়ে!

—পারবেই না—আমার ডান হাত দুহাতে টেনে তার মধ্যে মুখ গুঁজে বলল মন্দিরা, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

—ঝলমলি!—সুখের শিহরণে শিহরিত হয়েও বুকের মধ্যে হাহাকার, কিন্তু সে হাহাকার ঝলমলি বুঝতে পারল না, ঘুমিয়েই পড়ল।

কি অযোগ্য আমি, কি অযোগ্য! কি করে আমি এ মেয়ের হাত ধরব! ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমি যদি ওকে কোনো ছলে জীবনসঙ্গী করে নিই তাহলে

সে তো হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ওর বাবা মায়ের কৃতজ্ঞতা, ওদের সদয় ব্যবহার পরিণত হবে ঘৃণায়, ছারখার হয়ে যাবে মন্দিরার জীবন। না, না, এ হয় না, আমার সুখের কথা ভেবে আমি দুঃখে অশান্তিতে বিষময় করে ফেলব জীবন। অনেক সম্ভাবনা মন্দিরার জীবনে, ওর প্রতিভা সার্থক হয়ে উঠুক। আজই আমাকে পালাতে হবে, আর নয়। কলকাতায় ফিরে আমি না চেষ্টা করলে আর কোনো যোগাযোগের সম্ভাবনা থাকবে না। তা ছাড়া কলকাতায় ওদের বিলাসবহুল পরিবেশ আর ব্যস্ত জীবনযাত্রা এইসব কিছু ভুলিয়ে দেবে।

... পবিত্র ফুলের মতো মেয়ে ঘুমিয়ে আছে, কি সরলতা মাখা ওই মুখে ... এমন দীর্ঘ সময় ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ কখনো হয়নি। ... কি সুন্দর তুমি! কি সুন্দর ...

এই নির্জন বনভূমে সন্ধ্যা পেরোলেই গভীর রাত্রি। শুধু ঝিঁ ঝিঁর তীব্র শব্দ ভেসে থাকে চরাচরে। সাধুজি যেমন ব্রাহ্ম মুহূর্তে ওঠেন তেমন শুয়েও পড়েন তাড়াতাড়ি। আমিও ওইভাবেই চলছিলাম। আজ থেকে এ সবের শেষ। ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

জুতো খুলে মন্দিরে উঠলাম, বন্ধ গর্ভগৃহের সামনে বসে বুক ছেঁড়া যন্ত্রণা, কান্নায় ভেসে দেবতাকে প্রণাম করলাম, তারপর প্রণাম জানালাম সাধুজির উদ্দেশে, নেমে এলাম।

কি নির্জন পথ। শহর এখনো ঘুমায়নি ঠিকই কিন্তু এই দু কিলোমিটার পথ কি নির্জন। স্টেশন পর্যন্ত অনেকটা পথ যেতে হবে। দ্রুত পা চালালাম আমি।

পথ কিন্তু গেছে মন্দিরাদের বাড়ির সামনে দিয়েই, ওখানটাই ভয়। না, কেউ কোথাও নেই—দ্রুত পেরিয়ে এলাম।

... অনেক পথ হাঁটতে হবে, একা ... আমার মা, বৌদি, ভাইপো ভাইঝি সকলে অসহায় তাকিয়ে আমার দিকে ...

—একি? তুমি—তু-মি।

আমি নতমুখ।

—তুমি পালিয়ে যাচ্ছ?

আমি চুপ।

স্টেশনের ঠিক বাইরে আমি, ঢোকার মুখে ওনার সঙ্গে মুখোমুখি।

—আমি ভাবতেই পারছি না। আমি অন্যরকম কিছু ভেবেছিলাম।

আমি চুপ।

—এসো, একটু বসি, আমি এসেছিলাম টিকিট কাটতে, কালকেই ফিরব ভাবছিলাম, তোমারও টিকিট কাটলাম।

ওনাকে অনুসরণ করে স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসলাম।

—গাড়িতেই নামতে পারতাম, তা মন্দিরা বলল ছোটো ট্রেনে—বেচারী—বলছিল কেমন ঝুকঝুক করতে করতে নামবে, জানালার ধারে বসে, তারপর প্লেনে—! কত আশা করে—আমিতো ভাবতেই পারছি না। সব কেমন ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে। আমি অন্যরকম কিছু ভেবেছিলাম।

—আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার ভাবনা আমি জানি না।

চুপ করে উনি বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর—

আমি জানি তুমি ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। শিক্ষক হিসাবে তোমার সুনাম শুনে মেয়ের জন্য তোমাকে ডেকে এনেছিলাম। ব্যস ওই পর্যন্ত। কিন্তু পরে পরে জানলাম অভাবের জন্য তুমি গ্র্যাজুয়েশনের পর আর এগোতে পারনি, অনেক চেষ্টা করে চাকরিও পাওনি।

যাই হোক প্রায় এক বছর ধরে দেখলাম, তোমার ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, তার সুফলও কিছু দেখলাম, তখন ভাবলাম মাধ্যমিক পরীক্ষায় মন্দিরা পাশ করলে তোমাকে একটা পুরস্কার দেব, তোমার যোগ্যতার জন্যই দেব— আমাদের কোম্পানিতে তোমাকে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপে চাকরি দেব, প্রথমে ট্রেনি হিসাবে নিয়ে তোমাকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে ব্যাঙ্গালোর পাঠাব, তারপর পাশ করে এলে চাকরিতে যোগ দেবে। অবশ্য এই পিরিয়ডে তুমি হাজার দশেক টাকার একটা স্টাইপেন্ড পাবে। এ কথাটা আমি আমার পরিবারের দুজনকেও হাসির ছলে বলেছিলাম—দ্যাখো, যদি পাশ করে স্যারের ভাগ্য ফেরাতে পার।

কিন্তু তারপর অনেক কিছু ঘটে গেল—বিপর্যয়, এতদিন ধরে তিলতিল করে গড়ে তোলা আমার সোনার রাজত্ব ছারখার হয়ে যাবার অবস্থা। একজন সিনিয়র ডাক্তারের পরামর্শে কিভাবে যে ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম তা ঈশ্বরই জানেন। একটা বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে একজন ডাক্তার নার্স আয়া সঙ্গে করে প্রায় না খেয়ে না ঘুমিয়ে—যাই হোক প্রথমে শাস্তি দিলেও ভগবান পরে ক্ষমা করে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

তারপর তোমাকে পেলাম, মনে হল ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন, অবাক হয়ে দেখলাম, কী গভীর ভালোবাসা তোমার!

কিন্তু সে তো এক তরফা ভালোবাসা—কোনোক্রমে বললাম আমি।—তাই তো আমি পালিয়ে যাচ্ছি।

—না, দৃঢ় স্বরে বললেন উনি, সেটা ছিল আগের কথা, কিন্তু এখানে তোমার সংস্পর্শে সে তোমাকে কি গভীরভাবে ভালোবেসেছে এটা তুমি বুঝতে পেরেও মিথ্যে কথা বলছ।

—তাই, ঠিক তাই,—দুহাতে মুখ ঢেকে বেদনার্ত স্বরে বললাম আমি—আমি ওর উপযুক্ত নই, যোগ্য নই, ওর প্রতিভা, ওর জীবন আমি নষ্ট করে দিতে পারি না, ভালোবাসি বলেই পারি না।

—একমাত্র তুমিই পারো পাশে থেকে ওর প্রতিভাকে সার্থক করে তুলতে।

তোমার দায়িত্ববোধ, তোমার ধৈর্য্য, সব সবকিছুর পরীক্ষা হয়ে গেছে। আর যোগ্যতা? সে কেউ নিয়ে জন্মায় না, যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, যোগ্যতা অর্জন করার যোগ্যতা তোমার আছে।

উঠে দাঁড়ালেন উনি, আমার ব্যাগটা তুলে নিলেন, পিঠে হাত দিয়ে বললেন, —চলো, অনেক পথ চলতে হবে তোমাকে, অনেক দায়িত্ব নিতে হবে, সম্মানের সঙ্গেই নেবে, সেজন্য যোগ্য হয়ে ওঠো।